ওআঙ্গার মামা

বিমল কর

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

ছোটনকে

বাবা

প্রায় সাত-আট বছর আগে ওআন্ডার মামা 'আগামী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। নানা কারণে তখন লেখাটি অসমাপ্ত থেকে যায়। সম্প্রতি বই হিসেবে প্রকাশ পাবার সময় আগাগোড়া পরিমার্জন করে লেখাটি শেষ করা হয়েছে। এই বইয়ের সমস্ত ছবি এঁকেছেন আমাদের বন্ধু ও শিল্পী শ্রীঅহিভূষণ মালিক। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বিমল কর

আমাদের মফস্বল শহরে বরাবরই খুব শীত পড়ত। একেই তো জায়গাটা ছিল বিহারের পাহাড়ী এলাকা, তার ওপর আমাদের শহরের আশেপাশে ছিল যত রকম বন-জঙ্গল। ছোটনাগপুর পার্বত্য এলাকা বলতে ভূগোল বইয়ে যা বোঝাত আমরা তার চেয়েও বেশি বুঝতাম, অন্তত শীতকালে; পার্বত্য এলাকার দৌরাত্ম্যটা বেশ হাড়ে-হাড়ে অনুভব করতাম। তবু একথা ঠিক, আমাদের মফস্বল শহরটি ছিল খুব সুন্দর। মোটামুটি সবই ছিল সে-শহরে: দোকান, বাজার, স্কুল, ছোট হাসপাতাল, সাহেবসুবোদের পাথরঅলা একটা পুরানো গির্জা, আমাদের শিবমন্দির আর বারোয়ারী দুর্গাপুজোর মণ্ডপ, ছোট লাইনের রেল স্টেশন, বাস অফিস, এমন কি বায়োস্কোপ দেখার একটা ঘরও। সপ্তাহে দু'দিন বায়োস্কোপ হত—শনি আর রবি। তখনকার দিনে সিনেমাকে আমাদের মফস্বল শহরে সবাই বায়োস্কোপ বলত। আমরা কোনো নদী-টদী দেখিনি, ঝরনা দেখেছি ছোটখাট, পাহাড়ী নালা দেখেছি, কিন্তু নদী নয়। নদীর জন্যে আমাদের তেমন দুঃখও ছিল না। জল দেখতে হলে চলে যেতাম গির্জার দিকে—সেখানে মস্ত একটা ঝিল ছিল। পাহাড়ের পাথর দিয়ে যেন বাঁধানো ছিল ঝিলটা, কাচের মতন তার ঝকঝকে জল। বর্ষায় ঝিলটা কানায় কানায় ভরে উঠত, আর সারা বছরই সেই জল থাকত; গরমের সময় অনেকটা শুকিয়েও তা যেন শেষ পর্যন্ত আর শুকোত না; আমরা ভাবতাম, মাটির তলা থেকে জল ওঠে। ওই ঝিলের জলই ছিল আমাদের খাবার জল। ঝিলের একটু দূরেই একটা জলটাকি ছিল, আর পাশেই ছিল পাম্প হাউস। সকাল বিকেল পাম্প হাউসের ফট্‌ফট্‌

ফট্‌ফট্‌ শব্দ শোনা যেত।

আমাদের শহরে টিলা আর চাঁদমারি ছিল, সাহেবদের কবরখানা ছিল, ফুটবল ম্যাচ খেলার মাঠ ছিল, কিন্তু ইলেকট্রিক আলো এক রকম ছিলই না। বাঙালী ও বেহারী পাড়াতে তো কারোর বাড়িতেই নয়, সাহেব পাড়াতেও দুটো বাড়ি ছাড়া ইলেকট্রিক আলো ছিল না। সে বাড়ি দুটোর একটা ছিল সাহেবদের ক্লাব, অন্যটা ছিল হাণ্টারসাহেবের বাড়ি। ডায়নামো দিয়ে নাকি তার আলো জ্বালানো হত। যেমন জ্বলত বায়োস্কোপ হলে।

আমাদের পাড়ায় কেরাসিনের আলো জ্বলত, কখনো-সখনো পেট্রম্যাক্স বাতি। রাস্তায় টিমটিমে কতকগুলো কেরাসিন বাতি ছিল। কখনও জ্বলত কখনও বা জ্বলত্ না। বাজারে পেট্রম্যাক্স, কার্বাইডের আলো, দেওয়াল লণ্ঠন-টণ্ঠন জ্বালানো হত। তা হোক, আমরা কেউই আলো নিয়ে কোনদিন মাথা ঘামাইনি। তখনকার দিনে কেই বা ইলেকট্রিকের আলো নিয়ে মাথা ঘামাবে। আমাদের ছোট্ট সুন্দর শহর, অজস্র গাছপালা, আশপাশের টিলা আর পাহাড়, আমাদের স্কুল, খেলাধুলো এসব নিয়ে আমরা বেশ সুখেই ছিলাম।

সেবারে অ্যানুয়েল পরীক্ষার পর সবাই যখন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি আর সাত-সকালে ঘুম ভেঙ্গে গিয়ে লেপের তলায় ঠকঠকিয়ে কাঁপছি তখনই এ-গল্পের শুরু। পরীক্ষার সময় দেখেছি সকালে ঘুম ভাঙত না; বাবা ডাকছেন, মা ডাকছে, কাকিমা এসে ডাকছে তবু ঘুম আর ভাঙে না। যেই না পরীক্ষা ফুরিয়ে গেল, ওরে বাব্বা, ফরসা হবার আগেই কখন ঘুম পালিয়েছে। ঘুম ভেঙে গেলে লেপের তলায় শীতটা আরও যেন বেশী করে গায়ে লাগত; অথচ কার সাধ্য বিছানা ছেড়ে ওঠে। এদিকে মন তখন লেপের তলায় থাকতে চায় না, বন্ধুদের কাছে যাবার জন্যে ছটফট করছে।

সেদিন সকালের হিম-কুয়াশা কেটে রোদ উঠতে উঠতে একটু দেরী হলো। ততক্ষণে হাত মুখ ধুয়ে গরম হালুয়া আর ধোঁয়া-ওঠা

চা খেয়ে আমি তৈরী। ফার্স্ট ক্লাসে উঠতে যাচ্ছি বলে বাড়িতে চায়ের বরাদ্দ বাঁধা হয়েছে।

রোদ উঠতেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা অন্তুর কাছে। অন্তু আমার বন্ধু, প্রাণের বন্ধু। অন্তু, কানু, বিজন, টুলু, মানস— সবাই আমরা বন্ধু।

আমরা সকলেই প্রায় একই পাড়ায় থাকি, একই স্কুলে পড়ি, হয় একই ক্লাসে না-হয় এক-দু' ক্লাস উঁচু-নিচুতে। সকলেরই পরীক্ষা শেষ, সবাই আজ সাত-সকালে উঠে জেগে বসে আছে কতক্ষণে দল বেঁধে পলাশতলার মাঠে গিয়ে বসতে পারবে। পলাশতলার মাঠটা আমাদের পাড়ার শেষ দিকটায়, মাঠের তিন পাশে শুধু পলাশ ঝোপ, অন্য পাশ দিয়ে ছোট লাইনের গাড়ি যায় বাঁশি বাজিয়ে ধোঁয়া উড়িয়ে। ওই মাঠে আমরা বরাবর খেলাধুলো করেছি, গুলতানি করেছি।

আমাদের বড়রাও মাঠটার ভাগীদার ছিল। তা থাক, তাতে কিছু যেত আসত না।

কথা ছিল, পলাশতলার মাঠে গিয়ে আমাদের ক্রিকেট খেলার পিচ্ তৈরি হবে সারা সকাল। তারপর বাড়ি গিয়ে নাওয়া-খাওয়া সেরে মাঠে এসে 'লম্বা' ভার্সেস 'বেঁটে' দুটো দল করে প্র্যাক্টিস ম্যাচ খেলা হবে, বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। এই ম্যাচটা ছিল আমাদের জীবন-মরণ সমস্যার মতন। কেননা পরের দিন, রবিবার, আমাদের চেয়ে যারা বড়—সেই মণ্টুদাদের দলের সঙ্গে আমাদের ম্যাচ। গতবার আমরা জিতেছি, এবারে জিততে না পারলে টুলু, ব্রজ আমাকেই দুয়ো দেবে। আমি এবার ক্যাপ্টেন, গতবার ছিল ব্রজ।

অন্তুদের বাড়ি যাবার সময় শীতের চোটে আমার বেশ কাঁপুনি ধরছিল। হবেই তো; সময়টা ডিসেম্বরের মাঝামাঝি। এখন তো বাঘের শীত শুরু। যেতে যেতে মনে মনে আমাদের 'লম্বা'র দল ঠিক করে ফেলেছিলাম: আমি, অন্তু, হারু, বাসু, এইসব লম্বার দলে আর 'বেঁটে'দের দলে ব্রজ, টুলু বিজনরা থাকবে—ওরা

আমাদের চেয়ে বেঁটে।

প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে হিহি করতে করতে অন্তুদের বাড়ি আসতেই লিলির সঙ্গে দেখা। লিলি অন্তুর বোন। গায়ে পেল্লায় একটা সোয়েটারের ওপর ডলিদির উলের স্কার্ফ চাপিয়ে বাগানের রোদে দাঁড়িয়ে রোদ পোয়াচ্ছে। তার হাতে দুধের গ্লাস ; দুধ খাচ্ছে আর নাক সিঁটকোচ্ছে।

"এই, অন্তু কি করছে রে? উঠেছে না ঘুমোচ্ছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"কি জানি, দেখিনি," লিলি বলল।

"দেখিসনি?"

"উঠেছে হয়ত।" লিলি দুধের ঢোঁক গিলল।

"তুই কোন্ বাড়িতে ছিলি রে যে কিছুই দেখিসনি?"

"মামার বাড়িতে ছিলাম রে......" লিলি ভেঙচি কেটে বলল। লিলিটা বরাবর এই রকম। কারও তোয়াক্কা করে না। আমাদের তো নয়ই।

ওর পাশ কাটিয়ে এগুতে যাচ্ছি, লিলি বলল, "দাদা বেরিয়ে গেছে।"

"বেরিয়ে গেছে!" আমি অবাক, এত সকালে অন্তু কোথায় বেরুবে! বেরুলে সে আমার বাড়িতেই যেত। লিলিটা কোনো খোঁজখবর রাখে না, যা মুখে আসে বলে দেয়।

লিলির কথায় কান না দিয়ে পা বাড়াচ্ছি, আবার সে বলল, "বাড়িতে পাবে না। অন্তুদা স্টেশনে গেছে।"

"স্টেশন!......তবে তুই না বললি দেখিসনি?"

"দেখিনি তো! স্টেশনে গেলে কাউকে দেখা যায়!"

"তুই তো পরে বললি ঘুম থেকে উঠেছে হয়ত......"

"আহা, না উঠলে কি ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্টেশন যাবে।"

"হ্যাত......ইয়ারকি যত...! তুই বড় ইয়ারবাজ হয়ে গেছিস, লিলি।"

লিলি এবার মাথা দুলিয়ে হাসল। বলল, "যাও না, বাড়ির মধ্যে খুঁজে দেখগে যাও।"

"নেই ?"

"না।"

"স্টেশনে গেল কেন ?"

"মামাকে আনতে।"

"মামা ! কার মামা রে ?"

"কার মামা আবার, আমাদের মামা। ন্যাকামি করো না রাজুদা, আমাদের মামা আসছে তুমি জানো না ?"

অন্তুর এক মামা আছে এ-খবর আমার জানা ছিল ; কিন্তু তার মামা আসছে জানতাম না। মাথা নেড়ে বললাম, "বাঃ, আমি কি করে জানব। অন্তু আমায় কিছু বলেনি।"

লিলি হঠাৎ খুব হাসতে লাগল। তার হাসি ফুরোবার আগেই দেখি, অন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি টপকে চলে আসছে।

অন্তু আসতেই আমি লিলির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললাম, "লিলিটা পয়লা নম্বরের মিথ্যুক আর ইয়ারবাজ হয়ে গেছে। আমায় বলছিল তুই স্টেশন গিয়েছিস তোর মামাকে আনতে।"

অন্তু একবার লিলির দিকে তাকিয়ে যেন মজাটা বুঝে নিল। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "যাবার কথা ছিল। বিকেলে যাব।"

যে মামা সকালে আসবে তাকে বিকেলে আনতে যাওয়ার মানেটা কি আমি বুঝলাম না। মামাকে কি ওরা স্টেশনে বসিয়ে রাখবে নাকি ?

অন্তু বলল, "আমার বড়মামা আসছে। ছোটমামাকে তুই তো দেখেছিস। এরোপ্লেন চালায়। পাইলট।"

অন্তুর ছোটমামাকে আমি কস্মিনকালেও দেখিনি, তবে অন্তু আমাকে একটা ফটো দেখিয়েছিল একবার, বলেছিল তার

মামার ছবি। মামা এরোপ্লেন চালায়, বিলেতে থাকে, এদেশে বড় আসে না। তা চেহারাটা দেখে সাহেব-সাহেবই মনে হয়েছিল। বিলেতে থাকলেও থাকতে পারে মামা। তখন এরোপ্লেনই বেশি দেখা যেত না, তার ওপর যদি শুনি কেউ এরোপ্লেন চালায় তবে তো মানুষটিকে অবাক হয়ে সসম্ভ্রমে দেখারই কথা। আমি সেই থেকে অন্তুর ছোটমামাকে খুব সম্ভ্রম করতাম; ভাবতাম, ছোটমামার চোখ, বুক, হাত, সাহস, বুদ্ধি নিশ্চয় আমাদের মতন নয়, অন্য রকম মানুষ নিশ্চয় ছোটমামা। হয়ত সে রকম আর এখানে কেউ নেই, সাহেবদের মধ্যেও নয়। অন্তুর ছোট মামাকে দেখার একটা সাধ আমার ছিল। সেই ছোটমামা না এসে বড়মামা আসছে শুনে আমার আর কোনো আগ্রহ হল না।

অন্তু বলল, "বড়মামা কোত্থেকে আসছে জানিস?"

আমি কিছু প্রশ্ন করার আগেই লিলি বলল, "হো—হোকাইডো ইয়া-ইয়া" বলতে বলতে তার বিষম লেগে গেল।

অন্তু লিলির মাথায় বার কয়েক চাটি মেরে বিষম কাটিয়ে দিয়ে বলল, "বলতে পারিস না—বলতে যাস কেন? বুঝলি রাজু, নামটা বেশ খটমটে, হোক্কাইডো ইয়ামাশিকু…"

নাম শুনে মনে হল আমাদের ভৌগোলিক জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য কোনো জায়গা সেটা।

অন্তু বলল, "নে চল…বলছি তোকে সব।"

আমরা চললাম মানিকের বাড়ি, সেখান থেকে পলাশতলার মাঠে যাব। যেতে যেতে অন্তু বলল, "বড়মামা এখন আসছে জাপান থেকে। ওই যে হোক্কাইডো ইয়ামাশিকু বললাম—ওটা জাপানে। বড়মামা জাপানে আছে লাস্ট পাঁচ বছর। তার আগে ভাই, জার্মানীতে ছিল, সেখান থেকে রাশিয়া, রাশিয়া থেকে চীন ঘুরে জাপান। বড়মামা একজন সাইনটিস্ট। খুব বড় সাইনটিস্ট। ওসব দেশে বড়মামার নামে সবাই চিনতে পারে।"

"কি নাম রে?" আমি খুব আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম।

"ছোট করে লোকে বলে ওআণ্ডার মুখার্জী, আসল নাম মথুরানাথ মুখোপাধ্যায়।"

মথুরানাথ নামটা আমার তেমন পছন্দ না হলেও ওআণ্ডার মুখার্জী নামটায় বেশ মজা পেলাম, অবাকও হলাম। বললাম, "ওআণ্ডার মুখার্জী কেন রে?"

অন্তু হাঁটতে হাঁটতে রাস্তা থেকে একটা পাথর কুড়িয়ে দু'পা ছুটে গিয়ে ওভার পিচ্ বল করল, করে হাতটা একটু ঝাঁকিয়ে নিল। অন্তু আমাদের বোলার।

পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে অন্তু এবার বলল, "বড়মামা আশ্চর্য আশ্চর্য সব জিনিস আবিষ্কার করেছে, বোধ হয় তাই।"

"কি কি আশ্চর্য জিনিস রে?"

মাথা নাড়ল অন্তু, "তা জানি না। হবে অনেক কিছু। একটা জিনিস তো নয় রে, অনেক কিছু, অত কে মনে রাখে। আমরা কিছু বুঝব না!"

কথাটা অবশ্য ঠিক। তবু দু' একটা আশ্চর্য কিছু আবিষ্কারের কথা শুনতে ইচ্ছে করছিল। আমাদের শহরটা সুন্দর, ছিমছাম। হই-হট্টগোলের জায়গা মোটেও নয়। কিন্তু একটা অভাব আমাদের ছিল। এখানে নামকরা লোকজন কেউ আসত না। মহাত্মা গান্ধীর একবার আসার কথা হয়েছিল, আসেননি; স্যার জগদীশচন্দ্র বসু নাকি একবার—আমরা তখন জন্মেছি কিনা সন্দেহ—এদিক দিয়ে কোথায় যেন গিয়েছিলেন বলে গল্প শুনেছি।

অন্তু বলল, "কাল অনেক রাত পর্যন্ত বাড়িতে বড়মামার গল্প হয়েছে, বুঝলি রাজু। মা ছাড়া বড়মামাকে আর কেউ চেনেই না, বাবাও নয়। বাবা বড়মামাকে দেখেইনি। ফটো দেখেছে। তবে বাবা অনেক গল্পটল্প শুনেছে তো বড়মামার, তাই গল্প বলছিল। চিঠিফিটি আসে মাঝে মাঝে। কুড়ি-বাইশ বছর জার্মান, লণ্ডন,

রাশিয়া, জাপান-টাপান করে এইতো সবে দেশে ফিরেছে মামা। মাসখানেক আগে ফিরেছে বুঝলি, কিন্তু আসতে না আসতেই কলকাতা, দিল্লি, বম্বে···। লোকে খালি টানাটানি করে। এবার আর বড়মামা কোথাও যাবে না, সেরেফ আমাদের কাছে এসে থাকবে। আমাদের দেখতে ইচ্ছে করছে বুড়োর।" অন্তু হাসল।

ততক্ষণে আমরা বিজনদের বাড়ির কাছে পৌঁছে গেছি।

বিজনদের ওখানে কানু, টুলু, ব্রজ-ট্রজ এসে গেছে; চুনের পুঁটলি, কোদাল, মাপ-ফিতে, ঝুড়ি নিয়ে ওরা সবাই তৈরী। আমাদের দেখে ওরা চটেমটে বলল, "কি রে মুরশিদকুলি খাঁর দল, এত লেট্······।"

অন্তু হেসে বলল, "ইচ্ছে করে দেরী করলাম নাকি! হয়ে গেল!······নে, চল্······।"

ব্রজ বেহারী ছেলে, তার পুরো নাম বা আসল নাম বিরিজ মোহন, আমরা বলি ব্রজ, স্কুলেও মাস্টারমশাইরা তাকে ব্রজ বলে ডাকেন। ব্রজ একটু তেরিয়া মেজাজের ছেলে, হরিণের মতন ছুটতে পারে, কথা বলার সময় সামান্য তোতলামি করে। বাঙলা সে আমাদের মতনই বলে।

যেতে যেতে ব্রজ বলল, "কি করছিলি তোরা? ঘু-ঘুম মারছিলি?"

অন্তু বলল, "না রে, ভোর পাঁচটায় উঠেছি।"

"ত—তবে!"

"ঘরটর গোছানো হচ্ছিল······"

"হঠাৎ? তোরা কি বড়দিনের ঘর সাফ করছিস?"

"না। আমার বড়মামা আসছে হোক্কাইডো ইয়ামাশিকু থেকে।"

পুরো দলটাই থেমে গেল, গিয়ে হাঁ করে অন্তুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

অন্তু সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে গর্বভরে ভারিক্কি একটু হাসি হেসে বলল, "জায়গাটা জাপানে। জাপান থেকে আসছে বড়মামা। কথা ছিল সকালে আসবে, তারপরে টেলিগ্রাম এসেছে বিকেলে আসবে।"

"জাপান থেকে টেলিগ্রাম?" কান্নু চোখ গোল্লা করে বলল।

"জাপান থেকে কেন! ক্যালকাটা থেকে। তুই একেবারে মুখ্যু, কান্নু—" অন্তু বলল, "জাপান থেকে সরাসরি এখানে আসা যায়? জাপানটা কোথায় জানিস তো? না, তাও জানিস না?"

ব্রজ তার মাথার ছোট্ট, নেংটি ইঁদুরের মতন টিকিতে একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বলল, "বাস্ রে বাস্, তোর জা-জাপানী মামা আসছে!…"

"জাপানী মামা নয়, ওআণ্ডার মামা—!" আমি বললাম।

ওআণ্ডার মামা শুনে ওরা প্রথমটায় হকচকিয়ে গিয়েছিল, পরে অন্তু তার ওআণ্ডার মামার বৃত্তান্ত বুঝিয়ে বললে সবাই মিলে হই হই করে উঠল।

আমরা তারপর পলাশতলার মাঠে এসে খেলার জায়গা পরিষ্কার করে কোদাল চালিয়ে পিচ্ করতে লাগলাম, চুনের দাগটাগ পড়তে লাগল। শীতের রোদে সকলের গা-হাত-পা বেশ গরম হয়ে উঠল, আস্তে আস্তে ঠাণ্ডার দাপটটা যেন পালিয়ে গেল।

ব্রজ বলল, "অন্তু, তোর ও-ও-ওআণ্ডার মামাকে কাল আমাদের ম্যাচের আম্পায়ার করবি? বিশুদা ভীষণ চোট্টা, বড়দের জিতিয়ে দেবে।"

কান্নু বলল, "তার আগে কানে একটা ফুসমন্তর দিয়ে দিতে হবে মামাকে, ওদের বেলায় টপাটপ এল বি ডবলু।"

অন্তু বলল, "ধ্যুত…জাপানীরা ক্রিকেট খেলে না। মামাকে আমরা ম্যাচ দেখতে আনতে পারি।"

মাঠ তৈরী হয়ে গেলে আমরা পলাশ ঝোপে বসে একটু

জিরিয়ে নিচ্ছিলাম। বাড়ি ফিরে খেয়েদেয়ে আবার খেলতে আসতে হবে 'লম্বা' ভার্সেস 'বেঁটে'।

অন্তু বলল, "আমি ভাই চারটে নাগাদ চলে যাব। বাড়ি গিয়ে তৈরী হয়ে সকলের সঙ্গে স্টেশন যেতে হবে।"

মানস বলল, "সাড়ে পাঁচটায় ট্রেন, অত তাড়াতাড়ি যাবি কেন?"

"কাজ আছে।"

"কি কাজ?"

"বাড়িটা একটু সাজাতে হবে, ডেকরেসান—। দেবদারু পাতা, লাল নীল কাগজের ফ্ল্যাগ ঝোলাতে হবে। ফুলের টবগুলো বারান্দায় সাজাবো। অনেক কাজ। বুঝছিস তো, বিশ-বাইশ বছর পরে বড়মামা আসছে। অত নামী লোক। একেবারে কিছু না করলে মামার প্রেস্টিজ থাকে না।"

টুলু হঠাৎ বলল, "হ্যাঁরে, একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে। শুনবি?" প্ল্যানের ব্যাপারে টুলু আমাদের মাস্টার।

"কি প্ল্যান?" কানু বলল।

"সাড়ে পাঁচটায় ট্রেন। আমরা সাড়ে চারটের মধ্যে খেলা শেষ করে চল্ না সবাই স্টেশনে যাই। আমাদের স্কাউট ড্রেস আছে, ড্রাম বিউগল আছে, ফ্ল্যাগ আছে—ওআণ্ডার মামাকে স্টেশন থেকে নিয়ে আসি।"

ব্রজ হঠাৎ মাঠের ওপর চার-পাঁচটা ডিগবাজি খেয়ে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, "ওআণ্ডারফুল—ওয়াণ্ডার মামাকে কি বলে রে—কি বলে সেই যে—আমরা তাই করব।"

"রিসিভ—" মানস বলল, "রিসিভ করব।"

টুলুর প্ল্যান আমাদের পছন্দ হয়ে গেল। অন্তু তো খুবই খুশী। কিন্তু কথা হল, তার বাড়ির লোক এটা পছন্দ করবে কি না।

ব্রজ বলল, "আরে, কেউ কিছু বলবে না। নে চল্, ওঠ।"

বিকেলে একটু তাড়াতাড়ি খেলা ভেঙ্গে দিয়ে আমরা সকলে ছুটতে ছুটতে টুলুর বাড়িতে গিয়ে হাজির। কুয়াতলায় হাতমুখ ধুয়ে টুলুর ঘরে বসে দেদার মুড়ি কড়াইশুঁটি আর মাসিমার দেওয়া চা খেয়ে স্কাউট ড্রেস পরে নিলাম। টুলু আমাদের ক্লাব ম্যানেজার, তার কাছে আমাদের যাবতীয় খেলাধুলোর জিনিস, জাসিটার্সি থাকে। স্কাউট ইউনিফর্ম অবশ্য আমাদের বাড়িতে ছিল। যার ছিল না, সে অন্যেরটা পরল।

তারপর বারো চোদ্দ জনের দল স্কাউট ড্রেস পরে ড্রাম বিউগল বাজাতে বাজাতে স্টেশনের দিকে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের সামনে থাকল হারু আর বাসু, তাদের হাতে আমাদের সরস্বতী পুজোর সময়কার লেখা সেই "স্বাগতম" কাপড়টা। তখন বিকেল মরে ছায়া জমে কালো হতে শুরু হয়েছে। ডিসেম্বর মাসের বিকেল পাঁচটা প্রায়, এখুনি অন্ধকার হয়ে যাবে সব। আমাদের স্কাউট ড্রেস এবং ড্রাম বিউগল দেখে পাড়ার লোক তেমন অবাক হল না। পরীক্ষা শেষ হয়েছে, হয়ত আমরা 'মার্চ' প্র্যাকটিস করছি, বা স্কুলের কোনো ব্যাপারে যাচ্ছি—এরকম কিছু ভাবল। দু' একজন জিজ্ঞেস করল, "কি রে, বাজনা বাজাতে বাজাতে কোথায় চললি?" জবাবে আমরা বলেছি, "স্টেশনে।"

অন্তু আমাদের সঙ্গে ছিল না। সে বাড়ি চলে গেছে, সেখান থেকে বাড়ির লোকজনের সঙ্গে স্টেশনে যাবে। কথা ছিল, অন্তু স্টেশনে তার ওআণ্ডার মামার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেবে, তারপর ফেরার পথে আমরা ওআণ্ডার মামাকে প্রসেসান করে নিয়ে আসব বাজনা বাজাতে বাজাতে।

স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছে দেখি গাড়ি আসছে। আমরা পোঁ পোঁ ছুটতে লাগলুম, গাড়ি স্টেশনে এসে থামার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাদ্য শুরু হওয়া চাই—টুলুর সেইরকম নির্দেশ।

ততক্ষণে চারপাশ বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। স্টেশনের

ডে-লাইটগুলো সব জ্বালানো হয়নি, দু' তিনটে মাত্র জ্বলেছে; আর একটা সবে জ্বালিয়ে লাইট পোস্টের গায়ে-আঁটা হাতল ঘুরিয়ে আলোটাকে তারের টান দিয়ে ওপরের দিকে টেনে ঝুলিয়ে দিচ্ছে। গাড়ি এসে থেমে গেল।

আমরা ছোট মতন ওভারব্রিজটার ঠিক তলায় তখন। কানু সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পা হড়কে পড়ল। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করল না। ল্যাঙচাতে ল্যাঙচাতে পাশে এসে দাঁড়িয়ে তার লম্বা বাঁশিটা মুখে ঠেকিয়ে রাখল।

ওই তো অন্তুরা: অন্তু, লিলি, ডলিদি, সন্তু, কাকাবাবু, কাকিমা, পিসিমা। ডলিদির হাতে একটা মালা। সন্তুটা তিড়িং বিড়িং করে লাফাচ্ছে। অন্তু গাড়ির কামরার দিকে এগিয়ে কাকে যেন খুঁজছে। এমন সময়ে একেবারে শেষের দিকের কামরায় একটা হইহই শুরু হল, কুলিটুলিগুলো হুড়মুড় করে সেদিকে ছুটছে। আমরাও পজিসন ভুলে ছুটতে লাগলুম। স্কাউট আমরা, আপদ-বিপদ হলে দেখতে হবে তো।

ছুটতে ছুটতে গিয়ে দেখি কাকাবাবু কাকিমা—অন্তুর বাবা ও মা—সেখানে পৌঁছে গেছেন।

প্লাটফর্মের ওপর অদ্ভুত ধরনের একটি মানুষ দাঁড়িয়ে, তাঁর চারপাশে কুলিদের ভিড়, একদল উঠেছে কামরার ভেতর, আর একদল পাশের ব্রেকভ্যানে ঢুকেছে, গার্ডসাহেব ব্যস্ত হয়ে মাল-পত্র নামানোর তদারকি করছেন।

কাকিমা এগিয়ে গিয়ে সেই মানুষটির সামনে দাঁড়ালেন, একটু যেন ভয়ে ভয়ে। কাকাবাবুও এগিয়ে গেলেন।

তারপর যে কি হল ভাল বুঝলাম না, কাকিমা প্রণাম করলেন লোকটিকে, ডলিদি এসে মালা পরিয়ে দিল, সন্তু ফটাস্ ফটাস্ করে দু'তিনটে বেলুন ফাটিয়ে দিল, সেই অদ্ভুত চেহারার মানুষটি স্টেশনে দাঁড়িয়ে কাকিমার মাথায় হাত রেখে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলেন।
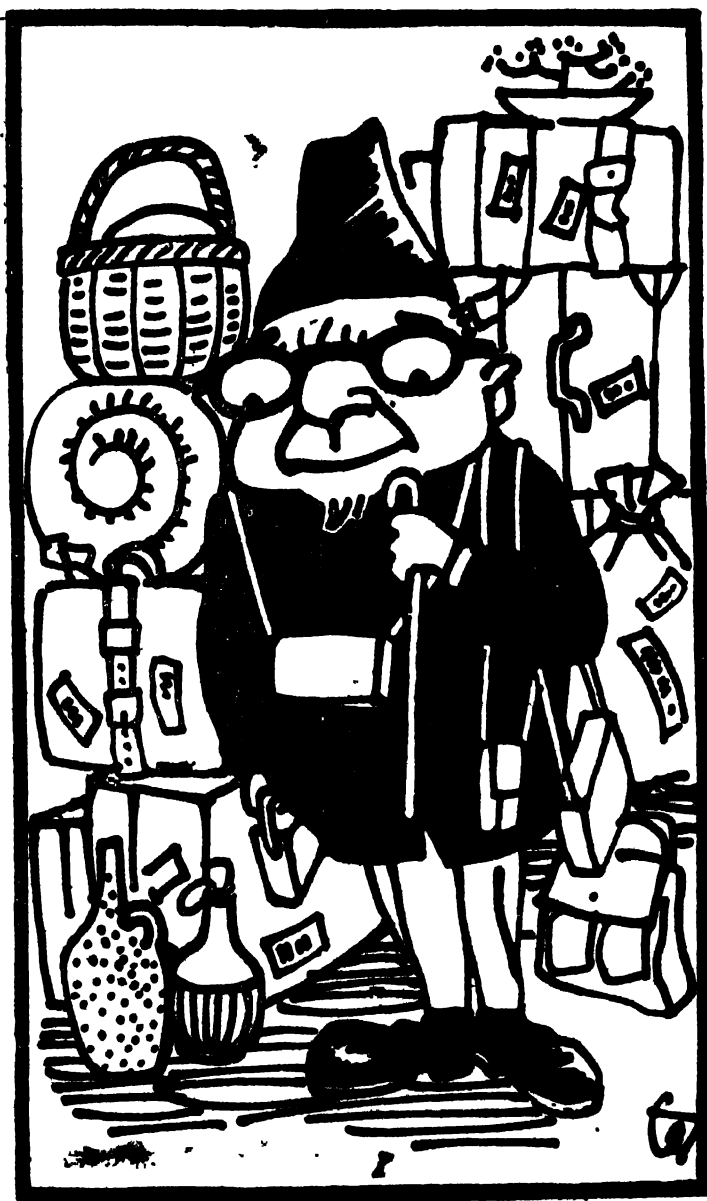
বাক্সর পর বাক্স, বড় বাক্স, ছোট বাক্স, চ্যাপ্টা বাক্স

বিশ-বাইশ বছর পরে দেখা হল বলে এই ধরনের কান্নাকাটি চলল একটু, কিন্তু আমরা বুঝতে পারলাম, উনিই অন্তুর বড়মামা —ওআণ্ডার মামা।

অন্তু মালপত্র নামানোর তদারকি করতে লাগল। ওরে সাবাস, মাল নামছে তো নামছেই, কামরা থেকে নামছে, ব্রেকভ্যান থেকে নামছে—নেমেই যাচ্ছে। বাক্সের পর বাক্স, বড় বাক্স, ছোট বাক্স, চ্যাপ্টা বাক্স, গোল বাক্স, কাঠের বাক্স, বেতের বাক্স। ক্যাম্বিস জড়ানো নানা ধরনের মালপত্রও নামতে লাগল, বিছানা নামল, বস্তা নামল, মস্ত একটা ছাতার মতন কি নামল, তারপর নামল এক সিন্দুক।

গাড়ি লেট্ হয়ে যাচ্ছিল। অন্যরা হাঁ করে এই মালপত্র নামানো দেখছে।

শেষে গাড়ি ছাড়ল, প্লাটফর্মের ভিড় কমল।

এবার আমরা ওআণ্ডার মামাকে ভাল করে দেখতে পেলাম। বেঁটে মতন চেহারা, মুখ একেবারে গোল, থুতনির কাছে একটু দাড়ি, মাথায় ফিনফিনে সাদা ধবধবে চুল, হাতে গম্বুজ ধরনের অদ্ভুত টুপি, চোখে দো-তলা চশমা, প্যান্টের পা বেশ সরু, পেটের কাছটা ভীষণ মোটা, গায়ে একটা গলাবন্ধ কোট, জাপানী মার্কা হবে হয়ত, বাঁ হাতে ছড়ি, মুখে চুরুট। পায়ের জুতো জোড়াও যেন চকচক করছিল।

কাকাবাবু কুলিদের দিয়ে মালপত্র ওঠাতে লাগলেন।

আমরা একপাশে সরে লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে টুলুর কথা মতন ব্যাণ্ড বাজাতে লাগলাম।

ডলিদি, লিলি যেন এতক্ষণে আমাদের দেখতে পেল। লিলি হাসতে লাগল।

অন্তু ইশারা করে বলল, বাজিয়ে যা।

আমরা আমাদের সবচেয়ে গুড়গড় গতটা বাজাতে লাগলাম।

ওআণ্ডার মামা একেবারে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের ব্যাণ্ড

শুনতে লাগলেন। যেন অ্যাটেনসান্ হয়ে দাঁড়িয়ে।

বাজনা শেষ হলে ওআণ্ডার মামা স্ট্যাণ্ড এট ইজ হলেন।

অন্তু যেন কি বলল তার বড়মামাকে। শুনে তিনি আমাদের দিকে এগিয়ে এসে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

অন্তু আমাদের নাম বলে গেল একে একে, ওঁআণ্ডার মামা কারও সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন, কারও মাথায় ছড়ির টোকা মারলেন, কারও কান টেনে দিলেন, কাউকে আবার আদর করে আঙুলের খোঁচা মারলেন। আর বার বার বলতে লাগলেন, "বাঃ! বাঃ! ভেরী গ্ল্যাড, ভেরী গ্ল্যাড। তোর বন্ধু সব, বাঃ বাঃ, গুড বয়েজ! কি রে বেটা, তোর মাথায় টিকি কেন? বাঃ বাঃ, টিকি রাখা ভাল।"

শেষপর্যন্ত আমরা ওআণ্ডার মামাকে সামনে নিয়ে প্রসেসান করে এগুতে থাকলাম।

ওভারব্রিজের কাছে এসে মামা বললেন, "তোদের স্টেশনে আলো এ রকম কেন রে?"

অন্তু বলল, "এই রকমই তো বরাবর।"

"বলিস কি! শহরে আলো নেই?"

"কেরাসিনের আলো আছে, পেট্রম্যাক্স আছে।"

"ও-সব কি আর আলো নাকি? আজকাল সভ্য লোকে এসব জ্বালায়! আচ্ছা, আমি তোদের আলো করে দেব।"

"আলো করে দেবেন?"

"ও, ইয়েস। সব আলো করে দেব।...ওআর্লডের আঠাশটা শহর আমার হাতের আলোয় দিন হয়ে আছে, তোদের এই পুচকে শহরটা আলো করতে পারবো না! বলিস কিরে?"

আমরা সবাই মিলে চিৎকার করে উঠলাম আনন্দে। আলো হবে—আলো হবে—, ওআণ্ডার মামা আমাদের শহর আলো করে দেবেন।

ওআণ্ডার মামাকে সাক্ষাৎ দেবদূতের মতন মনে হল তখন।

মামা বললেন, "তোদের এখানে গ্যাস-আলো করব। গ্যাসে আমার সুখ্যাতিটাই একটু বেশি।"

আমরা এবার থ্রি চিয়ার্স করে হাঁক ছাড়লাম। তারপর ওআগুার মামাকে নিয়ে ওভারব্রিজের সিঁড়ি ভেঙ্গে নামতে লাগলাম।
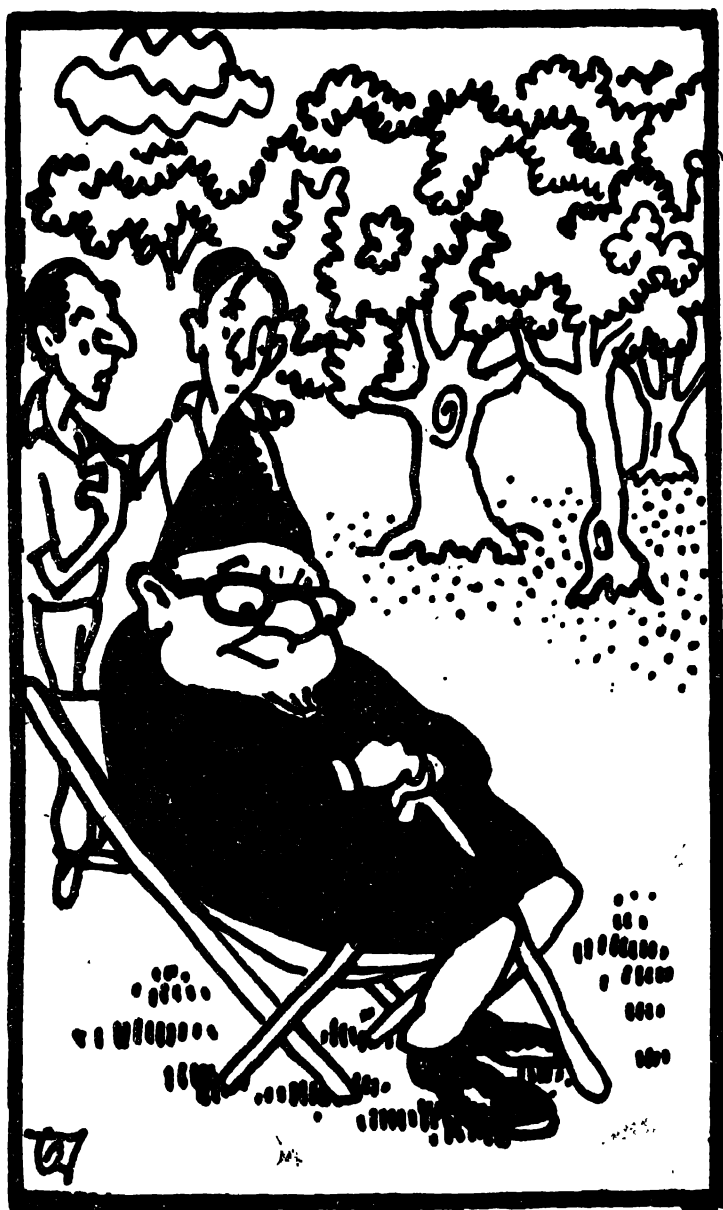
ক্যাম্বিসের চেয়ারে গা এলিয়ে শুয়ে মামা খেলা দেখছিলেন

২

পরের দিন পলাশতলার মাঠে ওআণ্ডার মামা আমাদের ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে এলেন। খেয়েদেয়ে জিরিয়ে চুরুট টানতে টানতে তিনি যখন এলেন তখন তুপুর, আমাদের লাঞ্চ খাওয়া হয়ে গিয়েছে, মটরশুঁটির ঘুগনি, পাউরুটি আর আলু-সেদ্ধ খেয়ে আমরা তখন ব্যাট করতে নেমেছি। মন্টুদার দল আমাদের বল যত পিটিয়েছে তত ছুটিয়েছে। ছুটতে ছুটতে কাহিল হয়ে গিয়েছিলাম সব, পা আর নড়ছিল না, খিদেয় মরে যাচ্ছিলাম। একটু আগে-ভাগে লাঞ্চ হল, মন্টুদারা আমাদের পেট ভরে আদর করে খাওয়াল, ব্রজ একাই তিন খুরি ঘুগনি সাবড়ে দিল। খুব করে খাইয়ে-টাইয়ে মন্টুদারা ডিক্লেয়ার করে দিল। আমাদের তু' দলের ম্যাচের নিয়ম ছিল আড়াই ঘণ্টা করে এক এক দল খেলবে। সময়ের হিসেবে আরও আধঘণ্টা ওরা খেলতে পারত, খেলল না। আমরা তখন বড় বড় ঢেঁকুর তুলছি। প্রথমে ব্যাট করতে নামল বিজন আর হারু। বিজন তু'চারটে বল ঠেকা দিয়েই আউট, রান বলতে তখন আমাদের মস্ত এক শূন্য। হারু লাঠি খেলার মতন করে কয়েকবার ব্যাট চালাল, তারপর বল মারতে গিয়ে কাটা সৈনিকের মতন উইকেটের ওপর ধপাস করে পড়ল। আমাদের রান তখনও শূন্য। এমন সময় ওআণ্ডার মামা এলেন।

আমরা ব্যাট করতে নামার আগেই মানস ওআণ্ডার মামাকে আনতে গিয়েছিল। উনি সেই রকমই বলে দিয়েছিলেন, তুপুরে আসবেন। মামা এসে বসতে না বসতে আমাদের টুনুও আউট,

রান হয়েছে চার। মামার জন্যে আমরা একটা ক্যাম্বিসের চেয়ার বয়ে এনে ছায়ায় রেখে দিয়েছিলাম। মামা এসে বসলেন।

মন্টুদারা তখন সবাই মাঠের মধ্যে হাসছে আর মজা করছে। করবেই তো, চার রানে তিন তিনটে উইকেট চলে গেছে আমাদের, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবার মতনই অবস্থা। কানুকে আমরা এবার ঠেলেঠুলে পাঠিয়ে দিলাম। সে আমাদের 'তাড়ু দি গ্রেট্', আসলে ও বোলার। কানু এমনিতে একেবারে শেষের দিকে যায়। কানুকে মাঠে ঠেলে দিয়ে আমরা একটু জল্পনা-কল্পনা করতে বসলাম। মাঠে মন্টুদারা তালি বাজিয়ে ঠাট্টাচ্ছলে কানুকে আদর করে ডেকে নিল।

আমরা যে গো-হারান হারব তাতে সন্দেহ ছিল না। ছি ছি, এই খেলাই আবার ওআণ্ডার মামাকে দেখাতে এনেছি!

মামা আগেই বলেছিলেন তিনি ক্রিকেট খেলাটেলা বোঝেন না; জার্মানীতে, রাশিয়ায়, চীনে, জাপানে কোথাও এ-সব খেলা হয় না। তবু আমাদের জন্যে তিনি মাঠে আসবেন।

ক্যাম্বিসের চেয়ারে গা এলিয়ে শুয়ে শীতের রোদে পা ডুবিয়ে বসে মামা খেলা দেখছিলেন, মুখে চুরুট। আমরা তখন জল্পনা-কল্পনা করছি। একটা বুদ্ধিটুদ্ধি ধার পাওয়া গেলে বাঁচি। অন্তু বলল, "মামাকে জিজ্ঞেস করি, কি বল?"

যিনি ক্রিকেট খেলাই বোঝেন না তাঁকে জিজ্ঞেস করে কি যে লাভ হবে বুঝলাম না। তার চেয়ে মরিয়া হয়ে একে একে মাঠে নেমে পড়া ভাল। কপালে নির্ঘাত হার, কে আর বাঁচাবে!

ব্রজ বলল, "ঠি-ঠিক কথা, মামাকে বল।"

"মামা কি করবেন, মামা তো আমাদের হয়ে রান করে দেবেন না", আমি বললাম। আমার আবার ক্যাপ্টেন হাবার জ্বালা, সেই সঙ্গে গো-হারান হারার অপমান।

ব্রজ বলল, "আরে মামা সাইন্স বলে দেবে···। সাইন্সে সব হয়।"

ব্রজটা একেবারে মুখ্যুর রাজা। সাইন্স দিয়ে কি রান তোলা

যায়! অন্তু আমার কথায় কান করল না, মাঠের দিকে এগুলো। অগত্যা আমিও এগুলাম। ব্রজব্রজও সঙ্গে চলল।

ততক্ষণে মাঠের চারপাশে, মানে ছায়ায় বসে যারা আমাদের খেলা দেখছে, আমাদের বন্ধু আর বাচ্চাটাচ্ছা, তারা হাততালি দিতে লাগল। 'তাড়ু' কানু কি আউট হল? বুকের মধ্যে ছ্যাঁক করে উঠেছিল। তাকিয়ে দেখি, কানু দু-দুটো বাউণ্ডারী হাঁকাল, পর পর।

ওআণ্ডার মামার কাছে এসে অন্তু বলল, "বড়মামা, আমরা হেরে যাব।"

মামা উঁচু করে মুখ তুলে আমাদের দেখলেন। তারপর বললেন, "হেরে যাবি?"

করুণ মুখ করে আমরা মাথা নাড়লাম।

ব্রজ বলল, "ওরা চোট্টা—মন্টুদারা, পাঁচ পাঁচটা ক্লিয়ার আউট দেয়নি। তারপর লাঞ্চে ঘুগনির সঙ্গে নিশ্চয় সিদ্ধি মিশিয়ে দিয়েছে। আমরা খুব খেয়েছি। এখন ঘুম পাচ্ছে, চোখে কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না।"

মামা ফুস ফুস করে বার কয়েক চুরুট টানলেন। ভাবছিলেন যেন। পরে বললেন, "এই খেলাটা তো দেখছি 'টোন্‌কা' খেলার মতন অনেকটা।"

'টোন্‌কা' যে কি আমরা জানি না। হাঁ করে মামার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

মামা বললেন, "নর্থ জাপানে এই ধরনের একটা খেলা হয়। তা তাদের খেলা ভো বল মারা আর ছোটা। টোন্‌কা খেলায় তোদের ওই কাঠিকাঠি পোঁতা থাকে না, চারদিকে গোল হয়ে একজনকে ঘিরে রাখে। ওদের বল আরও ছোট—ডিমের সাইজ···"

অন্তু চট করে বলল, "পিং পং বলের মতন?"

"অনেকটা, তবে বলগুলোর নানা রঙ, কোনোটা টুকটুকে লাল, কোনোটা সবুজ, নীল, হলুদ। তোদের হাতে যেমন—কি

বলে ব্যাট, ওদের হাতে থাকে ছোট্ট ছিপের মতন একটা কঞ্চি, কঞ্চিটার মাথায় একটা জাল, প্রজাপতি ধরার ছোট ছোট জাল দেখেছিস, বাচ্চারা খেলা করে? দেখিসনি? আরে ধর না— লিপিটিলি যেমন খোঁপায় জাল জড়ায় সেই রকম। ওই জালের মধ্যে বল গলিয়ে নিতে হয়। লাল বলে সবচেয়ে কম পয়েণ্ট, সাদা বলে সবচেয়ে বেশি পয়েণ্ট। প্রতিবারে ছ'টা করে বল দেবার নিয়ম।"

ব্রজ হুট্ করে জিজ্ঞেস করল, "আউট হয় কি করে?"

মামা বললেন "একটাও বল যেবার জালে জড়াতে পারবে না সেবারেই তুই বেটা আউট।...আর না হলে যদি তোর ছিপ বা জালে লেগে বল ক্যাচ উঠে অন্যের হাতে চলে যায় তবে আউট।...আরও সব ছোটখাটো নিয়ম আছে, আমি জানি না।"

মাঠের মধ্যে কানু ততক্ষণে আরও দশ বারোটা রান করে ফেলেছে। আমাদের ছোটর দল চটাচ্চট হাততালি মারছিল।

ওআণ্ডার মামা বললেন, "টোন্‌কা খেলা হল চোখের দৃষ্টিশক্তির খেলা। আই-সাইট ভাল হবে, রঙের চোখ থাকবে পাকা, তবেই তুই খেলতে পারবি। ওই জন্যে ব্রাইট কালার, মানে জ্বলজ্বলে রঙের বলে পয়েণ্ট কম, হালকা রঙে পয়েণ্ট বেশী। সাদা রঙে সবচেয়ে বেশী পয়েণ্ট।"

মামা তার নিবে-যাওয়া চুরুট আবার জুত করে ধরিয়ে নিলেন। বললেন, "তা বুঝলি, একবার আমাদের ওখানে খুব বড় একটা খেলা হবে, ফাইন্যাল ম্যাচ্, বাইরে থেকে মস্ত নামকরা একটা দল খেলতে এসেছে। আমাদের দলটার জেতার কোনো চান্স নেই; গো-হারান হারবে। তা ওরা এসে আমায় ধরল। বলল, একটা উপায় করে দাও। এমন করে ধরল যে, না বলতে পারলাম না। তারপর সারারাত ধরে ভেবেচিন্তে একটা টেলিও ম্যাগনিফাইয়িং কালারস্কোপ তৈরি করলাম। তৈরি করলেই তো হবে না, কাজে লাগাতে হবে। ভেবে দেখলাম,

চোখে সেঁটে থাকার একমাত্র উপায় হল গগলস্। তোরা গগলস্ চোখে এঁটে মোটর সাইকেল চালাতে দেখেছিস তো, সেইরকম ডিজাইনের হবে। ওটা গগলস্-এর মতন চোখে এঁটে খেলতে নামো—আর কোনো ভাবনা নেই; টেলিও ম্যাগনিফাইয়িং লেন্স থাকায় ডিমের সাইজের—কি বললি তোরা—পিংপং—তা সেই পিংপং বলগুলো ইয়া বড় বড় ফুটবলের মতন দেখাবে, তার ওপর রয়েছে কালার—মানে রঙ ধরার কায়দা, কালার ডিটেকটার···। বল জালে না জড়িয়ে যাবে কোথায়! খেলার আইন-কানুনে চশমা পরা চলবে না—এমন লেখা নেই।···কাজেই বাইরের বাছাধনরা একেবারে উজবুক হয়ে গেল। আমাদের দলটা ওদের গো-হারান হারাল। পরের বছর থেকে আমাদের ওখানে আর কেউ খেলতেই আসত না।" মামা গলা ছেড়ে হাসতে লাগলেন।

আমরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম। কী বোকা আমরা, কত বুদ্ধু। এমন ওস্তাদ মামা যাদের সহায় তারা নিজেদের বোকামির জন্যে মন্টুদাদের দলের কাছে গো-হারান হারবে! ছি ছি! হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছিল। কাল মামাকে ব্যাপারটা বললেই হত, মামা আমাদের এমন এক জোড়া গগলস্ করে দিতেন যা পরে মাঠে নেমে আমরা মন্টুদাদের বল হাঁকড়ে হাঁকড়ে ছত্রখান করে দিতাম। প্রত্যেকেই এক একটা সেঞ্চুরি। প্রত্যেক বলেই হয় ছক্কা, না হয় চার।

নিজেদের বোকামির জন্যে মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছিল।

মামা শেষে বললেন, "যাক গে, খেলা খেলা। জেতাও যা হারাও তাই। বড়দের কাছে হারবি তাতে লজ্জা কি!" বলে একটু থেমে চুরুটের ধোঁয়া ছাড়লেন। "আমি থিয়োরী অফ্ ফ্রিকসান নিয়ে প্রফেসার কাদাখোঁচার কাছে হেরে গিয়েছিলুম। প্রফেসার কাদাখোঁচা হল টোকিও ইউনিভার্সিটির বিরাট লোক। মহাপণ্ডিত, সারা জগত তাঁর নাম জানে, ফিজিস্ট—মানে

ফিজিক্সের লোক। দেবতার মতন মানুষ। আমি হেরে যাবার পর যখন দেখা করতে গেলুম, আমায় জড়িয়ে ধরে কী কান্না! বললেন, তোমার সঙ্গে লড়ে আমার বড় আনন্দ হয়েছে।"

হারু বলল, "নামটা কী বিচ্ছিরি, কাদাখোঁচা!"

মামা বললেন, "না রে হাঁদা, নাম কাদাখোঁচা নয়; পুরো নাম হল কোয়াদাতস্থ খোচাদাই, ও আর জিবে উচ্চারণ হয় না, তাই ছোট করে আমি বলতুম কাদাখোঁচা।"

মাঠে তখন হই-হই। কানু একটা ছক্কা মেরেছে।

ভেবে দেখলাম, আমরা হারব ঠিকই; কিন্তু এই হারায় লজ্জা পাবার মতন কিছু নেই। মন্টুদারা শুধু আমাদের চেয়ে বড় নয়, তারা চোট্টা, তারা পাঁচ পাঁচটা আউট দেয়নি, ঘুগনির সঙ্গে সিদ্ধি-টিদ্ধি কিছু একটা মিশিয়ে খাইয়ে দিয়েছে পেট পুরে, এরপর যদি তারা জেতে তবে সেটা চোট্টার জেতা, চুরির জেতা, আমরা যাকে বলতাম 'জ্যাক্লস্ উইন'। এই অদ্ভুত শব্দটা আমাদের ব্রজর তৈরী। ব্রজ একবার ক্লাসে 'ধূর্তের জয়'-এর ইংরেজী বলেছিল 'জ্যাক্লস্ উইন'। সেই থেকে আমাদের মুখে মুখে কথাটা চলে গিয়েছিল। অবশ্য ব্রজ ক্লাসে মাস্টার-মশাইয়ের কাছে তার ইংরেজীর জন্যে চার আনার চানাচুর উপহার পেয়েছিল। ইংরেজীর স্যার সদাশয়বাবু এত হেসেছিলেন যে, অতটা হাসির জন্যে ব্রজকে চার আনার চানাচুর আনিয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন—ব্রজ, তুই বিলেত যা, সাহেবদের ইংরিজী শিখিয়ে আয়।

এবার কানু আউট হল। আমার যাবার পালা।

মামা বললেন, "কিচ্ছু পরোয়া করবি না, বেড়াল পেটার মতন করে পিটবি। জেতাও যা, হারাও তাই।"

আমরা বেপরোয়া হয়ে মাঠে নামলাম। কানু আমাদের রান পঞ্চাশের ওপর তুলে দিয়েছে। আমরা আরও পঞ্চাশ তুলব। তারপর আছে অন্তু-টন্তু।

খেলাটা দেখতে দেখতে জমে গেল। একবার ব্যাট চালাতে গিয়ে এত জোরে ব্যাট হাঁকড়ালাম যে, ব্যাটটা হাত থেকে ছিটকে গিয়ে পটলদার পায়ের গোড়ালিতে লাগল। পটলদা বসে পড়ল পায়ে হাত দিয়ে, তারপর কাতরাতে কাতরাতে মাঠ ছেড়ে চলে গেল।

আমি চল্লিশ পর্যন্ত গিয়েই ফক্কা। অন্তু পঞ্চাশের ওপরে চলে গেল।

খেলা যখন শেষ, তখন আমরা মাত্র সাত রানে পিছিয়ে। শেষ জুটি খেলছিল। সময় শেষ হয়ে গেছে। কাজে কাজেই ড্র। মন্টুদারা আর কথা বলতে পারল না।

মামা আমাদের পিঠ চাপড়ে দিলেন, বললেন, "বা, বেশ হয়েছে। সাহসে সব হয়। ভেরী গ্ল্যাড্..., ব্রজ বেটা একেবারে হনুমানের মত লাফ মেরে মেরে খেলছিল।"

ওআণ্ডার মামা না থাকলে সেদিন আমরা নির্ঘাত হারতাম। মামা আমাদের চশমা করে দেননি বটে, তবে খেলার মাঠে এসে সাহস জুগিয়ে খুব রক্ষে করেছিলেন। মামা আমাদের 'গুড্ লাক্'।

মাঠ থেকে ফেরার সময় আমরা মামাকে সামনে নিয়ে ফিরলাম, যেন মামা আমাদের সত্যিকারের ক্যাপ্টেন।

দেখতে দেখতে মামার সঙ্গে আমাদের ভাবসাব হয়ে গেল। আমরা সবাই মামার ন্যাওটা হয়ে উঠলাম। আমাদের বেশির ভাগ সময় মামার কাছে, মামার সঙ্গেই কাটতে লাগল। সকালে একদফা মামার কাছে যাওয়া চাই-ই; বিকেলেও মামাকে সঙ্গে নিয়ে সারা শহর ঘুরে বেড়াতাম। গুরুজন হয়েও মামা আমাদের বন্ধু হয়ে উঠলেন। জ্যাঠাইমা—অন্তুর মা—আমাদের বলতেন, 'চেলার দল', জ্যাঠামশাই বলতেন, 'ক্ষুদে চেলা'। তা কথাটা ঠিকই; আমরা মামার চেলা হয়ে গিয়েছিলাম। মামার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে আমরা এটা-ওটা সব সময়েই খাচ্ছি; তিলকুট, রেউড়ি,

সেউভাজা, টফি, মাখন-বিস্কুট। মামা আমাদের খাওয়াতেন। ঠিক এই লোভেই যে আমরা মামার চেলা হয়ে গিয়েছিলাম তা নয়, মামার ওপর আমাদের ভক্তি-শ্রদ্ধা দিন দিন বাড়ছিল। অতবড় একজন মানুষকে আমরা দলে পেয়েছি, নিজেদের মধ্যে, এটা কি কম গর্বের! জার্মানীতে যাঁকে ঘরবাড়ি দিয়ে বরাবরের জন্যে রাখতে চেয়েছিল, রাশিয়ায় যাঁর জন্যে আট-আটটা ঘোড়া-টানা-গাড়ি বরাদ্দ ছিল, চীনে যাঁকে সম্মান জানানোর জন্যে তোপ দাগা হত, আর জাপান যাঁকে নিজের দেশের লোক বলেই মনে করত—সেই ওআগুার মামা কি আমাদের গর্বের জিনিস নয়! মামার কাছে আমরা বিদেশের অজস্র গল্প শুনতাম, নানা ধরনের গল্প। মামার কৃতিত্বের গল্পও শুনতাম—শুনে বুকটা ফুলে উঠত। আবার মামা মজার মজার গল্পও বলতেন, হেসে আমরা কুটোকুটি হতাম। মামার আবার অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন ছিল। যেমন, আমায় হয়ত জিজ্ঞেস করলেন, "নোখ কাটলে আবার বাড়ে, নাক কাটলে বাড়ে না কেন?" আমি বোকা হয়ে কি বলব কি বলব ভাবছি, মামা তুম করে টুলুকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা ধর, চাঁদের সেণ্টার থেকে একটা কাল্পনিক সুতোর মুখে টেনিস বল বেঁধে ঝুলিয়ে দিলি, বলটা পৃথিবীর কোন জায়গায় থাকতে পারে?" এ-রকম অদ্ভুত প্রশ্নে যখন ভ্যাবাচাকা খেয়ে টুলু চাঁদের সেণ্টার খুঁজছে মনে মনে, তখন মামা হয়ত অন্তুকে জিজ্ঞেস করে বসলেন, "পৃথিবীতে তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল, এই হিসেবে মানুষের মাথায় কত ভাগ গোবর আর কত ভাগ পদার্থ?" এসব প্রশ্নের আমরা কোনো জবাব দিতে পারতাম না।

মামা হাসতেন। কখনও-সখনও এক-আধটার জবাব বুঝিয়ে দিতেন।

মামার বয়েস হয়েছিল, প্রায় পঞ্চাশ-টঞ্চাশের ওপর। কিন্তু মামা একরত্তিও সময় নষ্ট করতেন না, কাজের মানুষ, সময়ের দাম বুঝতেন, কাজও বুঝতেন। অন্তুদের বাড়িতে—মানে নিজের বোনের

বাড়িতে এসে ওঠার পর, একটা কি দুটো দিন মামা একটু জিরিয়ে নিয়েছিলেন। ওই সময়ের মধ্যেই তিনি কাগজ পেন্সিল দিয়ে অন্তুদের বাড়ির গোটা ছক এবং বাগানের খোলা জায়গা-জমির নকশা করে ফেলেছিলেন। অন্তুর বাবা—আমাদের নৃপেন-জ্যাঠামশাই রেলের বড় চাকরি করতেন। তাঁর বাড়িটা বেশ বড়ই ছিল, বাড়ির বাইরে অনেকটা খোলামেলা জায়গা ছিল, বাগান ছিল। মামা সেই ফাঁকা—মাঠ মতন জায়গায় তাঁর নকশা মতন এক তাঁবু বসালেন। পুচকে তাঁবু নয়, বেশ বড় তাঁবু। কুলি-মজুর তেমন একটা লাগল না, বাড়ির চাকর-বাকর ছিল, আমরা সব ছিলাম। তাঁবুর মধ্যে কেমন সুন্দর গোটা তিনেক ঘর হয়ে গেল, জানালা হয়ে গেল। এসব কি আর আমাদের এখানে পাওয়া যায়, মামাই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলেন। জাপানী জিনিস। তাঁর সঙ্গে কেন যে অত বিচিত্র মালপত্র ছিল আমরা তা এখন বুঝতে পারলাম। তাঁবু খাটানো হয়ে যাবার পর সবচেয়ে বড় তাঁবু-ঘরে মামা হরেক রকমের জিনিসপত্র সাজাতে লাগলেন, কাঠের টেবিল, কেরাসিন কাঠের বাক্স, টুল—এই সবের ওপর মামা তাঁর অদ্ভুত অদ্ভুত যন্ত্রপাতি গুছিয়ে ফেলতে লাগিলেন। কোথাও একটা তালপাতার বাঁশির মতন সরু লম্বা ছোট দূরবীন, কোথাও কাচের ঘেরাটোপ বাক্সে পেনসিলের সিসের মতন দুটো কাঠি দুদিকে ঝোলানো, কোথাও পেট-মোটা গলা-সরু বোতল, বোতলের মধ্যে নানান রঙের জল, একদিকে সাইকেলের প্যাডেলের মতন একটা দাঁত-বের-করা যন্ত্র, তার সঙ্গে চেন, চেনের সঙ্গে আর একটা যন্ত্র বাঁধা, যন্ত্রের তলায় ছোট বড় চুম্বক। চিনেমাটির গোল গোল পাত্রে দস্তার পাত, তার মধ্যে অ্যাসিড্। সারাটা ঘর মামা এই ভাবে তাঁর যন্ত্রপাতি সাজাতে লাগলেন। পরের ঘরটায় ওষুধপত্রের শিশি বোতল, রবারের পাইপ, স্টোভ, জলের কল—এইসব থাকল। তার পাশের ঘরটায় মামার বসবার ইজিচেয়ার, কাগজপত্র, বই, খাতা

পেন্সিল, চুরুটের বাক্স।

এদিকে এইসব সাজানো গোছানো হচ্ছে; অন্যদিকে মামা আমাদের সঙ্গে নিয়ে বিকেলে সারা শহর ঘুরে বেড়িয়ে সব দেখেশুনে নিচ্ছেন। মামা বলতেন, "দাঁড়া, আগে সব সার্ভে করে নি।"

সার্ভে করা প্রায় শেষ হয়ে এলে মামা বললেন, "সাহেব পাড়াটা ওরা বেশ ফিটফাট করে রেখেছে, বুঝলি: ভেরী সেলফিস জাত ওরা। ইংরেজদের আমি এইজন্য দু' চোখে দেখতে পারি না। ইংল্যাণ্ডে আমি কখনও রাত কাটাইনি।"

ইংরেজদের ওপর আমাদেরও তেমন একটা ভক্তি ছিল না।

মামা বললেন, "আমি শুধু তোদের পাড়াটাতে—মানে এই এরিয়াটাতে আলো করব, আপ-টু বাজার। সাহেব পাড়াতে করব না। আমি স্বদেশী—" বলে মামা একটু থামলেন, কি ভেবে বললেন, "অবশ্য ওই ইংরেজদের একজন—ডবলু মারডক্ ১৮০২ সালে কয়লার গ্যাস দিয়ে বার্মিংহামের কাছে আলো জ্বালিয়েছিল। কিন্তু বুঝলি, ১৮০৭ সালে এক জার্মান, নাম উইনসর—বিলেতেই প্রথম গ্যাসের আলো জ্বালায়।·· তা যাক্‌গে···"

আমরা খুব খুশী। এই শহরের এ দিকটাতে আলো হয়ে যাবে। সাহেবরা অবাক হয়ে ভাববে, কি ব্যাপার—ইণ্ডিয়ানদের মহল্লায় আলো! আরে সাবাস, লালমুখোদের মুখের মতন জবাব হবে।

টুলু বলল, "মামা, আমাদের এই দিকটায় পুরো গ্যাস হতে ক'দিন লাগবে?"

মামা হাসলেন। "ক'দিন কি রে বেটা, ক'মাস লাগবে বল! লণ্ডনের রাস্তায় আলো জ্বলতেই পাক্কা দশটি বচ্ছর লেগে গিয়েছিল। আর তোদের এখানে এখনও তো কাজই শুরু করলাম না। শুধু দেখলাম। যেখানে যা মানায় তাই করতে হবে তো, দেখতে হবে, যেখানে করছি সেখানে কি কি জিনিস সহজে পাওয়া যায়।

তা তোদের এখানে দেদার জঙ্গল। গাছ, লতাপাতা, কাঠ এন্তার পাওয়া যাবে। কাজেই আমার প্রথম নজর থাকবে ওই দিকে। তারপর নজর দেব গরুর ওপর, গরু মোষ ছাগল··· ?”

আমরা হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকলাম। গরু ছাগল? গরু ছাগল কি হবে?

ব্রজ ফট্ করে বলে বসল, “গো-মাতা! গাই-ছাগল গ্যাস হবে?” গরুর গ্যাস হবে শুনে ভীষণ ভড়কে গেছে ব্রজ।

মামা আদর করে ব্রজর টিকি ধরে টান মেরে দিলেন। বললেন, “তুই বেটা ছাগল। ···না রে, গরুর গ্যাস হবে না। আমাদের দরকার গোবর। গরু মোষ ছাগলে কতটা গোবর-টোবর দেয় এখানে রোজ, তার একটা হিসেব করতে হবে। স্বদেশী গ্যাস, চিপ গ্যাস গোবর থেকে নিতে হবে বই কি!”

একটা দেওয়াল ঘড়ির মতন যন্ত্র চিত হয়ে পড়ে আছে

৩
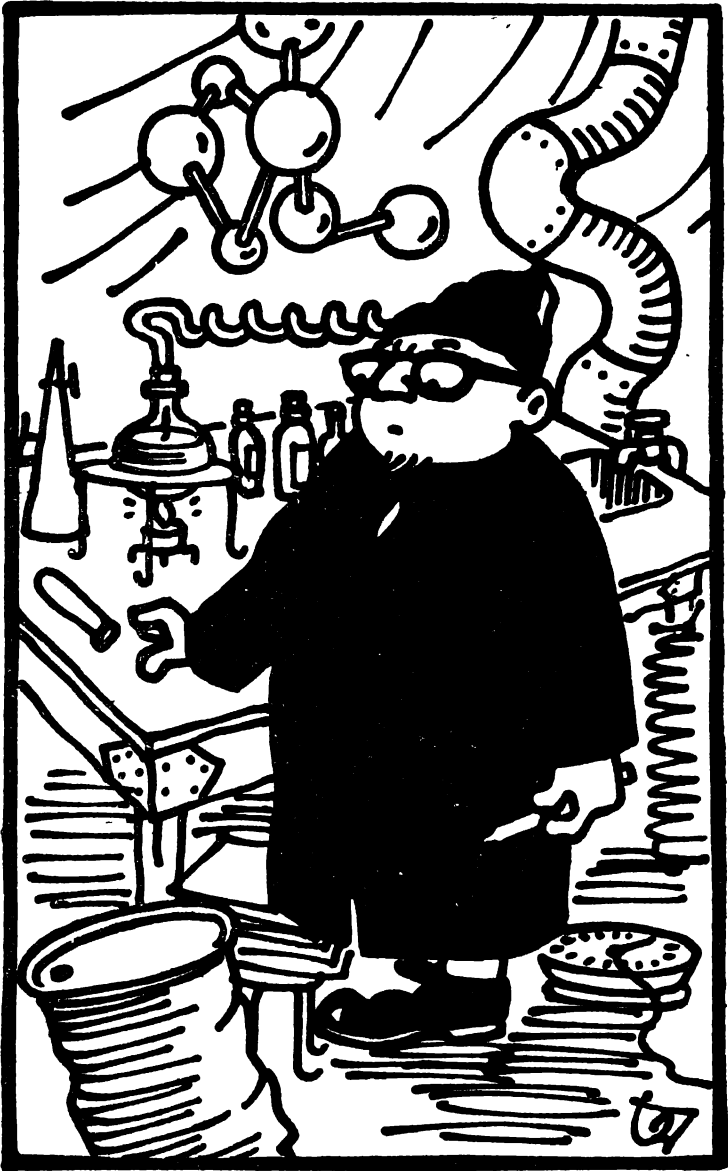
বড়দিনের ছুটি ফুরিয়ে নতুন বছর পড়ে গিয়েছিল। আমাদের স্কুলও খুলে গেছে। ক্লাসে ওঠা-উঠির পালা আগেই চুকেছিল, স্কুল খুললে নতুন ক্লাস, নতুন বই, খাতাপত্র তৈরি—এসব নিয়ে আমরা মত্ত হয়ে উঠলাম। লেখাপড়া তখন শুরু হয় নি; সরস্বতী পুজোর আগে কারই বা বইপত্র ছুঁতে ইচ্ছে করে। স্কুলটাও ঠিক বসত না, বসার নাম করে শুধু ঘণ্টাটা বেজে যেত। এই সময়টায়, শীতের ওই মরসুমে নানা অনুষ্ঠান ছিল স্কুলের: স্পোর্টস, প্রাইজ, স্কাউটদের ক্যাম্প, সরস্বতী পুজোর তোড়জোড়—কত কি! আমরা এইসব নিয়েই মেতে ছিলাম।

স্কুল নিয়ে যতই কেন না মেতে থাকি, বাড়ি ফিরে সবাই ওআণ্ডার মামার কাছে ছুটতাম। মামা ছাড়া আমাদের দিন কাটত না।

মামার কথা স্কুলে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল। আমরাই করেছিলাম। পাঁচমুখে কথা ছড়ালে যা হয়, সবাই নিজের মতন করে একটু একটু বানিয়ে নেয়, আমাদের পাঁচ মুখের বানানো কথায় ওআণ্ডার মামা আরও ওআণ্ডারফুল হয়ে গিয়েছিলেন।

অন্তুর নিজের মামা, কাজেই অন্তু সবার চেয়ে বেশী বেশী বলত; আর বলত, ব্রজ। ব্রজটা বরাবরের হাঁদা, দুমদাম কথা বলতে তার জুড়ি ছিল না। ব্রজই বলেছিল, মামা আর নিউটন একই, গত জন্মে মামা নিউটন হয়ে বিলেতে জন্মেছিলেন। এ জন্মে ইণ্ডিয়ায়।

মামার গল্প শুনে আমাদের অন্য বন্ধুরা বড় বড় চোখ করে

চেয়ে থাকত, মুখ থেকে কথা সরত না। ওরা বেপাড়ার ছেলে, কেউ কেউ 'মুনলাইট' বাসে চেপে স্কুলে আসত। তারা মামাকে দেখেনি। এক একদিন দল বেঁধে তারা মামাকে দেখতে আসত। মামার কাছে সকলেরই আদর, আমাদের বন্ধুরা এলে মামা তাদের মাথার চেহারা দেখতেন, কাউকে বলতেন, 'জিব বের কর'; কাউকে হামাগুড়ি দিতে বলতেন, কারও নাক টিপে দিতেন, তারপর প্রত্যেকের এক একটা আজব নাম দিতেন। সে নামের ঠিক-ঠিকানা ছিল না, কারও কোন জন্তুর নামে নাম হত, কারও বা নাম হত গ্রহ-উপগ্রহের নামে, কারও বা অন্য কিছু। যারা আসত, মামা তাদের হাতে কানা-সাহেবের দোকানের নোনতা বিস্কুট চকোলেট-টকোলেট তুলে দিতেন। হাতে হাতে নগদ পেলে কারই বা একটা শখের নামে আপত্তি থাকে। মামা যে-নামই দিন সবাই বেশ খুশী হত।

দু' চারজন অবশ্য ছিল যারা আমাদের বন্ধু নয়, শত্রু; তারা স্কুলে আমাদের নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করত আড়ালে, টিপ্পনী কাটত। আমরা কিছু বলতাম না, বাড়াবাড়ি করলে দেখে নেব —এই রকম ভেবে রেখেছিলাম।

পৌষ মাস যাই যাই করছে, মাঘ মাস সামনে, বাঘের শীত পড়ল আমাদের শহরে। কী যে ঠাণ্ডা! যেন শীতের ছুঁচ একেবারে হাড়ে ফুটছে সর্বক্ষণ। সবাই বলছিল, বছর কয়েকের মধ্যে এমন শীত আর পড়েনি।

ওই শীতের মধ্যে মামা একদিন বললেন, "আজ সন্ধ্যেবেলায় সবাই আসবি; আমার নকশাটা মোটামুটি হয়ে গেছে।"

নকশাটা যে গ্যাসের ব্যাপার নিয়ে তা আমরা জানতাম। মামার অনেক কাজ—, দিনের মধ্যে বারো চোদ্দ ঘণ্টা তিনি তাঁর তাঁবুতেই কাটান। বিচিত্র বেঢপ কত কি নতুন যন্ত্রটন্ত্রও তিনি বসিয়ে ফেলেছেন আরও। তাঁর গবেষণা আমরা বুঝতাম না; কিন্তু চোখের সামনে দেখতাম, কোথাও স্পিরিট ল্যাম্পের

ওপর একটা কাঁচের পাত্রে নীল জল ফুটছে, আঁকানো-বাঁকানো নল দিয়ে কি একটা খয়েরি রঙের জিনিস টুপ টুপ করে নীল জলে এসে পড়ছে ; কোথাও দেখতাম একটা দেওয়াল ঘড়ির মতন যন্ত্র চিত হয়ে পড়ে আছে, তার কাঁটা নড়ছে না ; কোথাও একটা দূরবীন তাঁবুর ছেঁদা দিয়ে আকাশমুখো হয়ে রয়েছে। ওরই মধ্যে মামা হাঁটছেন ফিরছেন, এক একবার এটা ওটা নেড়ে দেখছেন, তারপর নিজের জায়গায় এসে ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ারে বসে কাগজ পেন্সিল নিয়ে আঁকজোক, লেখালেখি করছেন। দিস্তে দিস্তে সাদা কাগজ শুধু মামার অঙ্ক আর আঁকজোকে চিত্র-বিচিত্র হয়ে থাকত। তাঁর চোখের চশমাটা নাকে ঝুলে পড়ছে, মুখে চুরুট, মামা একমনে কাগজ পেন্সিল নিয়ে লিখছেন আর লিখছেন—এ দৃশ্য আমরা প্রায়ই দেখতাম। দেখে কত ভক্তি হত, কত ভাল লাগত।

অত কাজের মধ্যেও যে মামার মাথায় গ্যাসের চিন্তাটা রয়েছে এ আমরা জানতাম। মামাও বলতেন।

নকশার কথা শুনে আমরা মহানন্দে নেচে উঠলাম।

কানু বলল, "কিন্তু সন্ধ্যেবেলা যা ঠাণ্ডা পড়বে, হাত-পা বরফ হয়ে যাবে!"

মামা বললেন, "কিছুই হবে না। তোদের গরম করে দেব। ...মাফলার-টাফলার, বাঁদুরে টুপি যার যা আছে নিয়ে আসিস সব। আর পায়ে মোজা পরে আসবি।"

উরে ব্যাস্—সেদিন বিকেল থেকেই কী ঠাণ্ডাটাই পড়ল। আর দেখতে না দেখতে শীতের অন্ধকার এসে একেবারে সন্ধ্যে করে ছাড়ল। কনকনে বাতাস। গরম জামার মধ্যে আমরা কেঁপে উঠছি। তবু একে একে সবাই মামার তাঁবুতে গিয়ে হাজির হলাম বিকেলের পর, সন্ধ্যের আগেভাগেই। মামা মস্ত একটা অলেস্টার গায়ে চাপিয়েছেন, পায়ে গরম মোজা, মাথায় একটা গরম টুপি। আমরা যেতেই মামা বললেন, "বসে পড় সব।"

বাড়ির ভেতর থেকে হোক কিংবা চাকর-বাকরদের ঘর থেকে হোক, একটা ছোট মতন তক্তপোশ আনিয়ে রেখেছিলেন মামা। তক্তপোশের ওপরে মোটা গদি করে কার্পেট পাতা, তার ওপর মস্ত সুজনি। একপাশে একটা মোটা কম্বল পড়েছিল। আলো জ্বলছে। আমরা হাত-পা গুটিয়ে তক্তপোশের ওপর বসলাম, মামা বললেন,"শীত করলে পায়ের ওপর র‍্যাগ টেনে নিবি।"

আমরা জড়সড় হয়ে গোল চক্কর করে বসলাম সবাই। বসার পরে মনে হল, তাঁবুর মধ্যে বসে আছি, সন্ধ্যে হয়ে গেল তবু এখানে সেরকম একটা ঠাণ্ডা তো লাগছে না। কি জানি কেন, হয়ত গায়ে গায়ে হয়ে সবাই বসে আছি বলেই। মামা বললেন, "বোস্ তোরা, কাজের কথা পরে হবে, আগে একটু করে চিচিকারি খেয়ে নে।"

চিচিকারি কি আমরা বুঝলাম না; হাঁ করে মামার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

মামা একটু অন্যমনস্ক, বার বার তাঁবুর দরজার দিকে তাকাচ্ছেন। তারপর অন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "কই রে, ডলিটা করছে কি?

অন্তু বলল, "বলল তো নিয়ে আসছে।"

আমরা ভাবলাম চিচিকারিটা বাড়িতে তৈরী হচ্ছে, ডলি নিয়ে আসবে।

কানু বলল, "মামা, চিচিকারি কি?"

মামা তাঁবুর দরজার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বললেন, "জানিস না?"

"কারি জানি", কানু বলল, "ঝোলের নাম কারি। মটন কারি।"

জবাবে মামা বললেন, "এ ঝোল ঝাল বা অম্বল নয়, মোহন হালুয়া-টালুয়া নয়, খেয়ে দেখ আগে তবে বুঝবি।"

ডলি আসছে না দেখে মামা ব্যস্ত হয়ে উঠে তাঁর ডাক-

ঘন্টিটা বাজাতে লাগলেন। একেবারে হালফিল মামা এই ঘন্টিটা তাঁবুর বাইরে লাগিয়েছেন। মন্দিরে-টন্দিরে কিংবা বারোয়ারি পুজোয় যেরকম ঘণ্টা বাজানো হয় আরতির সময়—সেই রকম এক ঘন্টি মোটামুটি—বেশ বড় সাইজের—ঘন্টিটা বাইরে একটা খুঁটির গায়ে ঝুলোনো, একটা সরু দড়ি দিয়ে ঘন্টির ভেতরের দোলকটা বাঁধা। আর সেই দড়িটা তাঁবুর মধ্যে মামার চেয়ারের হাতলের কাছ পর্যন্ত এসেছে। মামা সেই দড়ি ধরে টানলে ঘন্টিটা বাজে। অবশ্য খুব জোরে নয়।

মামার ঘন্টিতে কাজ হল। একটু পরেই লিলিদি এসে হাজির, হাতে কাঠের একটা বড় ট্রে। ট্রের ওপর একপাশে কাচের বড় বড় দু'টো ডিশে সিঙ্গাড়া; অন্যপাশে সাত-আটটা খালি কাপ। সিঙ্গাড়া তো চোখে দেখেই চেনা যায়, তবে মামার চিচিকারি কোনটা?

মামা লিলিদিকে ট্রে-টা নামিয়ে রাখতে বলে সিঙ্গাড়ার দিকে তাকালেন, "ভেজে আনলি?"

লিলিদি বলল, "মা ভেজে দিল।······তোমায় আলাদা করে দি।"

"না না, ওখানেই থাক, আমি একটা নেবোখন।" বলে মামা আমাদের দিকে তাকালেন, "নে নে, তোরা জগন্নাথ হয়ে বসে আছিস কেন? হাত মুখ চালা।"

আমরা হাত মুখ চালাবার জন্যে তৈরী হয়ে বসেছিলাম। সিঙ্গাড়ার ডিশগুলো ব্রজ আর হারু টেনে নিল, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আট-দশখানা হাত ঝাঁপিয়ে পড়ল। উস, কী গরম! আঙুলে ধরতে পারি না, জিব ঠোঁট পুড়ে গেল। তা যাক্ পুড়ে, ফুলকপির অমন সিঙ্গাড়া কে ছাড়ে!

মামা দেখি ফাঁকা কাপগুলো নিয়ে পাশের তাঁবু-ঘরে চলে গেলেন।

লিলিদি হেসে বলল, "তোদের কোন পরব হচ্ছে রে?"

"কেন, কেন?" সিঙ্গাড়ায় ফুঁ দিতে দিতে আমি বললাম।

"মামার মাথাটা আরও খারাপ করে ছাড়বি।"

"কি যে বলে লিলিদি", কানু বলল, "মামার মাথা অত সস্তা কি না!"

লিলিদি হাসল, কিছু বলল না।

"লিলিদি, চিচিকারি কি খাবার?"

"চিচিকারি—!" লিলিদি জীবনে এমন নাম শোনেনি খাবারের, বোকার মতন তাকিয়ে বলল, "চিচিকারি! সেটা আবার কি? কোথায় খেলি?"

"খাইনি; খাব। মামা খাওয়াবেন।" টুলু বলল।

ব্যাপারটা এতক্ষণে যেন জলের মতন বুঝে ফেলল লিলিদি; মুখ দেখে তাই মনে হল। বুঝে ফেলেও কেন যেন মুখে একটা চাপা হাসি লেগে থাকল লিলিদির। বলল, "ও, তাই বুঝি কাপের তাগাদা।...তা বসে বসে তোরা চিচিকারি খা, আমি যাই। যা শীত!"

মামা আসার আগেই লিলিদি চলে গেল। ও-পাশের তাঁবু-ঘরে মামা যে আমাদের জন্যে চিচিকারি তৈরী করছেন আমরা তা বুঝতে পেরেছিলাম। খাদ্যটা কি রকম হবে, চা কোকো না পায়েসের মতন, তা অবশ্য বুঝতে পারলাম না।

একটু পরেই মামা এলেন। মামার হাতে চিচিকারির কাপ।

একে একে মামা মাথা গুনে প্রত্যেকের জন্যে প্রায় পুরো কাপ চিচিকারি এনে নিজের জায়গায় বসলেন।

"নে—গরম গরম খেয়ে নে, জুড়িয়ে গেলে টেস্ট নষ্ট হয়ে যাবে।" মামা হাত বাড়িয়ে পাশের একটা টুলের ওপর থেকে এক দিস্তে কাগজ উঠিয়ে নিলেন।

চিচিকারি জিনিসটা দেখতে অনেকটা তেঁতুল গোলা গুপচুপ (ফুচকা)-এর জলের মতন দেখাচ্ছিল। বেশ গরম, যেন ধোঁয়া উঠছে এখনও।

কোলের ওপর দিস্তে খানেক কাগজ রেখে, পাশের ছোট

চিচিকারির রঙ দেখে আমাদের একটু কিন্তু-কিন্তু হচ্ছিল...

বেতের টেবিল থেকে মামা একটা গোল মতন পাকানো হাত খানেক লম্বা কাগজ তুলে নিলেন। বললেন, "আমার গ্যাস্ তৈরীর পুরো ছক এর মধ্যে আছে, বুঝলি। এই স্কীমের তিনটে পার্ট। একেবারে ডাল-ভাতের মতন সহজ করে করেছি, জটিল করলে সব গোলমাল হয়ে যাবে, তোদের এখানে জটিল জিনিস কেউ বুঝবে না।...কই, খা, খেয়ে নে ; শরীর গরম হয়ে যাবে।"

চিচিকারির রঙ দেখে আমাদের একটু কিন্তু-কিন্তু হচ্ছিল বোধ হয়, কেউ আর আগ বাড়িয়ে কাপটা মুখে তুলছিলাম না ; অপেক্ষা করছিলাম, কেউ একজন মুখে তুলুক আগে, তারপর তার মুখের চেহাবা দেখে আমরাও মুখে তুলব।

ব্রজই আগে কাপ মুখে তুলে লম্বা চুমুক।

তার মুখের চেহারাটা আমরা লক্ষ করলাম। গরমের জন্যে জিবটা বোধ হয় একটু পুড়েছিল। নাক-মুখ কুঁচকে তুললেও বমির কোনো ভাব করল না ব্রজ। তারপর আমাদের দিকে তাকাল, গলা পরিষ্কার করার জন্যে কাশল বার দুই। বলল, "ঝাঁঝ!"

আমরাও একে একে কাপ মুখে তুললাম।

জিনিসটা সুস্বাদু নয়, আবার একেবারে বিস্বাদও নয়। আমার কেমন গলার কাছটা জ্বালা জ্বালা করতে লাগল।

মামা ততক্ষণে গোল মতন কাগজটা খুলে আমাদের দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। মস্ত একটা সাদা কাগজ, গোটা দুয়েক কাগজ জুড়ে নকশাটা হয়েছে। নকশার মধ্যে লাল নীল পেন্সিলের অজস্র দাগ আর ফুটকি। মামা বললেন, "এই নকশা বোঝার আগে তোদের কতকগুলো গোড়ার জিনিস বুঝতে হবে। যেমন আমি আগেই বলেছি, আমার গ্যাস্ স্কীমের তিনটে পার্ট—এ বি সি। 'এ' পার্টটায় রয়েছে গ্যাস-মেটিরিআল, মানে কি কি জিনিস দিয়ে গ্যাস তৈরী করা হবে তার কথা। ও ব্যপারে আমার যা বক্তব্য তা আমি এই কাগজে লিখেছি—" বলে মামা কোলের ওপর রাখা

কাগজ দেখালেন।

কানু বলল, "মামা, চিচিকারিতে আদার রস আছে, না?"

মামা কথাটা কানে তুললেন না, গ্যাস-পরিকল্পনা বোঝাতে লাগলেন: "আমি আগেই বলেছি, লোক্যাল আর চিপ মেটিরিআল দিয়ে এখানে গ্যাস প্রডাকশন করতে হবে। তার মানে হল, এখানে খুব সহজে যা পাওয়া যাচ্ছে তাই দিয়ে গ্যাস করতে হবে। এখানে আমরা পাচ্ছি গাছপালা আর গোবর। এই দুটো জিনিস হবে আমাদের গ্যাস প্রডাকশনের মেটিরিআল।"

হারু বলল, "মামা, চিচিকারিতে পেঁয়াজ আছে?"

চোখ তুলে তাকালেন মামা। "কেন?"

"পেঁয়াজ পেঁয়াজ গন্ধ ছাড়ছে।"

"ছাড়ুক। খেয়ে নে।" মামা সোজা জবাব দিলেন। তারপর বললেন, "আমি একটা হিসাব করেছি মোটামুটি। তাতে দেখছি, গ্যাসের জন্যে রোজ মণ পঞ্চাশেক মেটিরিআল দরকার।"

"পঞ্চাশ ম-ণ?"

"পঞ্চাশ মণ কিছু না। পঞ্চাশ মণে শুধু রাস্তার বাতি হবে, সন্ধ্যে ছ'টা থেকে দশটা পর্যন্ত জ্বলবে। শুক্লপক্ষে জ্যোৎস্নার সময় বাতি জ্বালাবার দরকার তেমন নেই।"

"পঞ্চাশ মণে ক'টা বাতি জ্বলবে, মামা?" ব্রজ জিজ্ঞেস করল।

"তিরিশ চল্লিশটা," মামা বললেন, "দু'পাঁচটা কম বেশি হতে পারে।...যাক্, এ-সব পরের কথা। পঞ্চাশ মণ মেটিরিআলের মধ্যে কাঠকুটো গাছপাতা দিয়ে মণ পঁয়ত্রিশ করতে হবে, বাকি পঁচিশ মণ গরুমোষের গোবর দরকার। তোদের এখানে গরুমোষ কত?"

প্রশ্নটা বড় বেয়াড়া। এই শহরের অনেক কিছুর খোঁজ-খবর আমরা রাখি, কিন্তু কে আর গরুমোষের খবর রাখতে গেছে! আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম।

মামা চুরুট ধরিয়ে নিয়ে বললেন, "কাল থেকে গরুমোষ গুনতে লেগে যা সব। একটা হিসেব দরকার।"

ব্রজ বলল, "শ-দেড়শ' গোমাতা আছে।"

মামা হেসে বললেন, "তুই বেটাও আছিস, ছাগল। আচ্ছা তা হলে, স্কীমের যেটা পার্ট 'এ'—সেটার তোরা আইডিয়া পেলি। পার্ট 'বি' হল—গ্যাস তৈরির প্রসেস, মানে কি ভাবে জিনিসটা তৈরী করা হবে। সেটার নকশা আমি করে রেখেছি। ওটা যন্ত্রটন্ত্রর ব্যাপার, নানা রকম খুঁটিনাটি আছে—পরে তোদের বোঝাতে হবে। স্কীমের পার্ট 'সি' হল—এই নকশা—যা তোরা দেখছিস, এটা হল গিয়ে, গ্যাসটা কি ভাবে কোথা দিয়ে আসবে, কোথায় কোথায় আমাদের লাইট পোস্ট হবে তারই একটা নকশা।" বলে মামা নকশাটা আরও ছড়িয়ে দিলেন, চার কোণ থেকে আমরা চারজন চেপে ধরলাম কাগজটা, মামা আরও ঝুঁকে পড়লেন। বাতিটাও এগিয়ে দেওয়া হল।

মামা বললেন, "দেখতে পাচ্ছিস সকলে?"

সমস্বরে 'হ্যাঁ' বললাম। দেখলাম, কিন্তু কিছু বুঝতে পারছিলাম না। ম্যাপে যেমন রেলপথ জলপথ দেখানো দাগ থাকে অনেকটা সেই রকম দাগ। কিন্তু অজস্র আঁকবাঁক, অগুনতি ফুট্‌কি—লাল নীল, কোথাও কোথাও তারকা চিহ্ন। এ একটা ধাঁধা; মাকড়শার জাল নয় যদিও, তবু সেইরকম জটিল।

মামা একটা লম্বা মতন কাঠি নিয়ে আমাদের নকশা বোঝাতে লাগলেন। বললেন, "ব্যাপারটা কিছু নয়, খুবই ইজি। তোদের সেই অত দূরের জলটাকি থেকে যেমন করে জল আসে পাইপ দিয়ে, সেই রকম মাটির তলা দিয়ে আসবে আমাদের গ্যাস পাইপ। এই যে এখানটায় দেখ—কি দেখছিস?"

"জলের ড্রাম," কানু বলল।

"ড্রাম নয়, ওটা আমি ওই ভাবেই এঁকে রেখেছি, ওটা হল গ্যাস রিজার্ভার, ওখান থেকে আমাদের গ্যাস আসবে।"

"ওটা। কোথায় হবে মামা?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"তোদের পলাশতলার মাঠে। ওটাই কাছাকাছি ফাঁকা জায়গা।"

"গ্যাস টাঁকি হবে?" ব্রজ বলল।

মামা মাথা নাড়লেন; তারপর ম্যাপ দেখাবার মতন করে লম্বা কাঠিটা লাল নীল দাগের ওপর বুলোতে বুলোতে এগিয়ে চললেন।

"গ্যাস পাইপ আসবে এইসব জায়গা দিয়ে। রুটটা দেখে রাখ, সোজাসুজি আনিনি, আনলে সুবিধে না হয়ে অসুবিধে হত।"

"কেন?"

"সোজা পথে মানুষজন হাঁটে, গরুমোষের গাড়ি যায়, টমটম ছোটে। একটু ঘুরিয়ে এনেছি, মাটি সেখানে শক্ত। তাছাড়া তোরা তো আর লোহা-টোহার পাইপ দিচ্ছিস না, দিচ্ছিস মাটির পাইপ। ওপরের চাপে পাইপ ফেটে যেতে পারে।"

মাটির পাইপ আমরা কস্মিনকালেও দেখিনি, বললাম, "মামা, মাটির পাইপ কি করে হবে?"

"কেন?"

"কে করবে?"

"কুমোর, মাটির চওড়া চওড়া চাকা দিয়ে কুয়ো বাঁধায় দেখিসনি? এখানে ওসব অবশ্য দেখতে পাবি না। আমাদের বেঙ্গলে পাবি। সেই রকম গোল গোল চাকা জুড়ে পাইপ লাইন তৈরী হবে।"

জিনিসটা যেন না বুঝেও আমরা বুঝে ফেললাম। বিজন বলল, "দি গ্র্যাণ্ড।"

মামা কাঠি চালাতে চালাতে বললেন, "এই যে সব স্টার চিহ্ন দেখছিস—এইখানে লাইট পোস্ট বসানো হবে শাল কাঠের। পাইপ লাইন থেকে রবারের নল দিয়ে আমরা পোস্টে কানেকশন নিতে পারি। রবারের নলের খরচ কম।"

ব্রজ বলল, "মামা, রবারের নল গরু-ছাগলে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে।"

মামা বললেন, "সে-সব আমি ভেবেছি। গরু-ছাগলকে বিশ্বাস নেই। আমি ঠিক করেছি, ফুট পাঁচেক পাইপ কাঠের ভেতর দিয়ে আনব, কাঠের মধ্যে গর্ত করে। বাকিটা গায়ে জড়িয়ে দেব। দেখতে বেশ লাগবে।"

"লতার মতন, না ?" অন্তু বলল, "ডিসেণ্ট হবে।"

ব্রজ বলল, "মামা, রেল স্টেশনের লোকো ঘরের দিকে গাড়ির সেই পাইপ পড়ে থাকে।"

"কোন পাইপ ?"

"ওই যে কামরার পিছুতে থাকে, আগেও থাকে। মোটা মোটা, কালো মতন। কামরার পাইপে পাইপে জুড়ে দেয়। ভ্যাকম পাইপ। ওটা খুব শক্ত।" ব্রজ হাত নেড়ে নেড়ে বোঝাল।

মামা বললেন, "রেলের জিনিস তোদের দেবে কেন!··· যাকগে, সে পরে দেখা যাবে। এখন এই হল অবস্থা। আমি আরও ভেবেচিন্তে সব ফাইন্যাল করি। তোরা আমায় গরু-ছাগলের হিসেবটা এনে দে।"

বিজন খুব বিজ্ঞের মতন বলল, "মামা, গড়গড়ার নল দিয়ে পাইপ হবে না ! দেখতে খুব বিউটিফুল।"

মামা মাথা ছুলিয়ে ছুলিয়ে বললেন, "না, গড়গড়ার নল বাবুগিরির জন্যে—ওতে কোনো কাজ হয় না।···তোরা আমায় গরুমোষের হিসেব এনে দে—ওটা জরুরী।"

হিসেবটা আনা কষ্টকর, তবু মামা যখন বলেছেন, তখন আনতেই হবে। আমরা মাথা নাড়লাম। সভা ভাঙার সময় হল, রাতও হয়ে আসছে।

চিচিকারির কথাটা এবার আমিই জিজ্ঞেস করলাম, "মামা, চিচিকারি কি ?"

"কেমন খেলি আগে তাই বল।"

"মিষ্টি আছে, তবে খুব ঝাঁঝ—গলা জ্বালা করছে।"

মামা হেসে হেসে বললেন, "জিনিসটা খুব হাইজিনিক। জাপানে থাকতে সারারাত বরফ চাপা-পড়া এক ঘোড়াকে এই খাইয়ে বাঁচিয়ে দিয়েছিলাম। অবশ্য ঘোড়ার ডোজ খাইয়ে। আমার এক জাপানী বন্ধুর কাছে প্রথমে জিনিসটার নাম শুনি, তারপর এক্সপেরিমেন্ট করে তৈরি করি।... জাপানী একরকম মুলো আর জাপানী মরিচ—এই হল তোর আসল জিনিস, তার সঙ্গে আছে আমাদের শুকনো তুলসীপাতা, আদা পেঁয়াজের রস, মিছরি।...খুব ভাল জিনিস। টনিকের মতন কাজ করে।"

এবার আমরা উঠে পড়লাম। এই ঠাণ্ডায় বাড়ি ফিরতে হবে ভেবে দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছিল। চিচিকারিটা ভালভাবে খাইনি, খেলে এমনটা হত না।

বিজন বলল, "মামা, এখানে বেশ গরম ছিল।"

মামা হাত দিয়ে তক্তপোশের তলা দেখলেন। কানু তক্ত-পোশে ঝুলে পড়া সুজনি ওঠাল। দেখলাম, তক্তপোশের তলায় কাঠকয়লার বড় বড় তিনটে কড়ার আগুন প্রায় নিবে এসেছে।

৪

দেখতে দেখতে মাঘের মাঝামাঝি হয়ে গেল। গোড়ায় গোড়ায় শীতটা যে ভাবে চেপে ধরেছিল, তাতে মনে হত আমাদের শহরটা না ঠাণ্ডায় জমে বরফ হয়ে যায়। শহরটায় যে বরফ পড়ে তা নয়, তবে তেমন ঠাণ্ডা পড়লে বরফ পড়তেও তো পাবে। ওআণ্ডার মামার কাছে আমরা বরফ-ঢাকা শহরের গল্প শুনে, ছবি দেখে প্রায়ই এই মজার কথাটা ভাবতাম। মামা আমাদের রাশিয়ায় বরফ পড়ার গল্প শুনিয়েছিলেন অনেক, তার মধ্যে একটা মজার গল্প কিছুতেই ভুলতে পারতাম না। মামা যখন রাশিয়ায় ছিলেন, সে প্রায় অনেক দিনের কথা, একবার শীতের গোড়াতেই হুট করে একদিন সকাল থেকে বরফ পড়তে শুরু করল। রাশিয়ার লোকে বরফে ভয় পায় না, গ্রাহ্যও করে না, বিলেতে যেমন বৃষ্টি, রাশিয়াতে তেমনি বরফ-টরফ গা-সওয়া। পড়ছে বরফ পড়ুক; শীতে তো বরফ পড়বেই। কেউ আর গা করল না। তা, সকাল থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির মতন সেই যে বরফ পড়া শুরু হল মামাদের শহরে, তা আর থামল না। দুপুর গেল, বিকেল হল—তখনও বরফ পড়ছে।

পড়ুক। সন্ধ্যে থেকে বরফ পড়া বাড়ল; সারা রাত ধরে পড়েই চলল। পরের দিনও বিরাম নেই, রাস্তাঘাট সাদা হয়ে এসেছে, গাছপাতার অর্ধেকটাই সাদা, ঘরবাড়ির মাথায় সাদা তুলোর মতন বরফের রাশি। পড়ছে তো পড়ছেই, বরফ পড়ার আর শেষ নেই। দ্বিতীয় দিনেও একটানা বরফ পড়ে গেল।

কী শীত আর ঠাণ্ডা তখন! পরের দিনও বরফ পড়ছে, আরও যেন জোর হয়েছে। এইভাবে তিন চার পাঁচ দিন কেটে গেল। মামাদের শহরে বরফ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না, সাদায় সাদা সব, রাস্তা মাঠঘাট গাছপালা বাড়ি সব বরফে ঢেকে গেছে, মানুষজন পথে বেরোয় না, পশুপাখি সব পালিয়েছে, না হয় মরে গেছে। শেষ পর্যন্ত এমন অবস্থা, ঠাণ্ডায় বাড়ি ফাটছে, জলের পাইপ ফাটছে, কারখানার চোঙা ফাটছে, বয়লারও ফাটছে, সে এক ভয়ঙ্কর অবস্থা, কোথাও কিছু না, তবু সর্বক্ষণ সমস্ত শহর জুড়ে কি এক তছনছ কাণ্ড হয়ে যাচ্ছে। খালি ফাটছে, আর ফাটছে। মানুষজন ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে যত রাজ্যের গরম জিনিস গায়ে চাপিয়েও ঠকঠকিয়ে কাঁপছে ঠাণ্ডায় আর ভয়ে।

খাবার-দাবার জমে গেছে, একটু জল মুখে দিতে হলে আগুন জ্বালিয়ে বরফ গলিয়ে নিতে হয়।...ছয় দিনের দিন একেবারে মর-মর অবস্থা; কেউ আর স্বাভাবিক ভাবে নিঃশ্বাস নিতে পারছে না, বাতাসটাই যেন বরফ হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। ওদিকে আবার আবহাওয়া অফিস থেকে খবর ছড়িয়ে পড়ল, আজ রাত থেকে বাতাস জমে বরফ হয়ে যেতে পারে।...খবরটা কেমন করে ছড়াল সেটাই আশ্চর্য। টেলিফোন অচল, মানুষজন পথে বেরুচ্ছে না, এক যা ভরসা রেডিও তাই বা ক'টা আস্ত আছে শহরে, বড় জোর পনেরো বিশটা।......যাই হোক, খবরটা মামাদের কানে পৌছতেই সবাই পাগলের মতন কাণ্ড করতে লাগল; কি হবে? কেমন করে নিঃশ্বাস নেব? হায় ভগবান, শেষ পর্যন্ত বাতাসের অভাবে মরব? ইঁদুর বেড়ালের মতন মরতে হবে? মামাকে কনফারেন্সে ডাকা হল, বাড়ির মধ্যে কনফারেন্স। অক্সিজেন অক্সিজেন রব উঠেছে চারপাশে। কোথায় অক্সিজেন, কে দেবে? কোথায় পাওয়া যাবে অত অক্সিজেন?......মামা ভেবেচিন্তে একটা বুদ্ধি বের করলেন, বললেন—আমাদের ইণ্ডিয়ান স্টাইলে এ-সমস্যার সমাধান হতে পারে। গুরুগোয়াশোভ নামে এক ডাক্তার বলল,

সেটা কি? তোমাদের ইণ্ডিয়া তো গরমের জায়গা, তার আবার ঠাণ্ডাদেশ সম্পর্কে ধারণা কি?......মামা বললেন, আমরা গরম দেশের লোক বলেই গরমের ব্যাপারটা ভাল বুঝি। আমার মত হল, বাড়ির মধ্যে মস্ত এক ধুনি জ্বালো—ধুনি নিবলে চলবে না। ধুনির চারপাশে আমরা বসব আর বসে অনবরত নাকে সরষের তেল টানব।......গুরুগোয়াশোভ বলল, সরষের তেল? সেটা কি জিনিস? মামাও অবশ্য বুঝলেন যে, সরষে জিনিসটা ওরা বুঝবে না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল অলিভ অয়েলের সঙ্গে স্মেলিং সল্টের গুঁড়ো মিশিয়ে নাকে টানতে হবে।...হলও তাই। খবরটা যথাসাধ্য ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হল। খুব রক্ষে, পরের দিন বরফ পড়া বন্ধ হল, রোদ উঠল আর দুপুর থেকে বরফ গলতে শুরু হল। ওই অত বরফ যখন গলতে লাগল—তখন আবার বন্যার অবস্থা। সারা শহরটা যেন গলা ডুবিয়ে জলে ভাসছে। তিন দিনের দিন সেই জল নামল শহর থেকে। জল সরে গেলে মনে হল, গোটা শহরটাই যেন আর একবার নতুন করে জন্মাল।

এই গল্পটা মামার মুখে সবিস্তারে শুনতে শুনতে আমরা যত অবাক হয়েছি তত হেসেছি। কিন্তু সেই থেকে মাথায় ওই এক অদ্ভুত চিন্তা ঢুকে গিয়েছিল। যদি সত্যিই এরকম হয়—হঠাৎ এই শহরে বরফ পড়তে শুরু করে, দিনের পর দিন, তবে? কি হবে তবে? কেমন হবে?

মামার মাথায় এইসব বিচিত্র ভাবনা আসত বোধ হয়। আমাদের আচমকা ওই রকম কিছু একটা বলতেন, তারপর আমাদের ঘুম চলে যেত, আমরা অসম্ভব সব কথা ভাবতাম।

এ-সব কি হয় নাকি? মাথার ওপরকার চাঁদটা একদিন ভেঙে পাঁচ কি সাতখানা হয়ে গেল, হয়ে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ল, এ কি ভাবা যায়? তবু মামা ওই ভাবনাটা ধরিয়ে দিলেন হয়ত। হয়ত হুট করে একদিন বললেন, আচ্ছা ধর, হাজার তিনেক বছর ধরে ছুটতে ছুটতে একটা তারার আলো পৃথিবীতে এসে পৌছল, সেই তারাটা

কতদূরে আছে? অঙ্ক করে হিসেব কর—।...এসব হিসেব করতে বসলেই আমাদের মাথায় তারাটারা একাকার হয়ে যেত। সন্ধ্যে বেলায় আকাশে তারা ফুটলে দেখতাম আর ভাবতাম। শেষে অত তারা, অত বড় আকাশ দেখতে দেখতে ভয় ধরে যেত। মামা বলতেন, দেখ রে নেফুর দল, (ভাগ্নের দলকে মামা রগড় করে নেফুর দল বলতেন) এই জগতটা এমনিতে সাদা-মাটা, একবার যদি ভাবতে বসিস আর কোনো কূল-কিনারা পাবি না। তা বলে কি ভাববি না? ভাববি। যত ভাববি, তত হাবুডুবু খাবি, ততই ইমাজিনেশান খুলবে। হোক না আজগুবি ভাবনা, আজগুবিরও দাম আছে। ক'টা লোক ভাবতে পারে রে! দু'দশটা লোকই পারে। লিলিপুটের গল্প পড়িসনি? আহা, খাসা গল্প। ওটাও তো আজগুবি! জুলে ভার্নের লেখা পড়েছিস? সেও কি কম আজগুবি নাকি? রামায়ণ মহাভারতে কি পড়েছিস? হনুমান লাফ মেরে সাগর পেরুচ্ছে, ভগীরথ গঙ্গা আনছে—এও তো আজগুবি। কিন্তু তাতে কি! আজগুবিও সুন্দর। মামার এইসব কথাবার্তা আমাদের বড় ভাল লাগত। কি বুঝতাম, কতটা বুঝতাম জানি না, কিন্তু মনে হত মামা যা বলছেন তা সত্যি।

মাঘের মাঝামাঝি থেকে শীতটা বেশ পড়ে আসতে লাগল। আর ক'টা দিন পরেই সরস্বতী পুজো। স্কুলের পুজোয় আমরা ছিলাম সবাই কিন্তু দেখাশুনা করত মোহিনীবাবু আর পণ্ডিত মশাই, আমাদের কোনো কর্তৃত্ব ছিল না।

পাড়ায় আমাদের নিজেদের ক্লাব, কানু যার সেক্রেটারী, ম্যানেজার থেকে আরম্ভ করে হেড্ পিয়ন একাই সব ছিল—সেই ক্লাবের সরস্বতী পুজোই ছিল আমাদের নিজেদের। আমরা সেখানে সবাই যেন কর্তা। তা ছাড়া পুজোটা বরাবরই করছি, না করলে 'লফে' হব এ-রকম একটা ভয়-ভাবনা তো থাকবেই। আমরা তাই নিজেদের ক্লাবের পুজো নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলাম। চাঁদার খাতা হাতে বাড়ি

বাড়ি ঘুরছি ; বাজারে মুদির দোকান থেকে মটর-কড়াইয়ের দোকান' কোথাও আর চাঁদা চাইতে বাকি রাখছি না। মামাকে আমরা আমাদের প্রেসিডেন্ট করেছিলাম। এবারে মামা যখন আছেন তখন চাঁদা যাই জুটুক, পুজোটা যে জমকালো করে হবে তাতে আমাদের সন্দেহ ছিল না।

সেদিন বিকেল-বিকেল বেরুবো ঠাকুর পছন্দ করে আসতে। প্রসাদজীর বাড়িতে যেতে হবে। এ তল্লাটে এক প্রসাদজীর বাড়িতেই পাঁচ সাতটা ঠাকুর তৈরী হয়, প্রসাদজী থাকেন ধোবিতলাও-এর কাছে। দলবল মিলে অন্তুকে ডাকতে গিয়েছি, মামা এসে বললেন—চল আমিও যাব।

ধোবিতলাও খানিকটা দূর। শর্টকাটে যাবার রাস্তাটাও বড় নোঙরা। মামার একটু বাতের ধাত। ক'দিন বাতের ব্যথায় মামা খানিকটা ভুগছিলেন। মামাকে কি অতটা নিয়ে যাওয়া উচিত হবে ?

বিজন বলল, "মামা, ধোবিতলাও অনেকটা দূর।"

"উসমে কিয়া ?" বলে, মামা একটা হিন্দী হুঙ্কার দিলেন।

আমরা হেসে ফেললাম। কানু বলল, "মামা, অত হাঁটলে আপনার বাত বাড়বে।"

মামা কথাটা গা করলেন না, হাতের ছড়িটা দিয়ে কানুর পেটে আলগা খোঁচা মেরে বললেন, "ক্যাভামি করিস না, চল।"

আমাদের কিন্তু তেমন একটা ইচ্ছে করছিল না। মামার কষ্ট হবে। মামাকে আমরা কষ্ট দিতে চাই না।

আমি কাঁইকুঁই করে বললাম, "রাস্তাটা যাচ্ছেতাই। শর্টকাটে আপনি যেতে পারবেন না।"

"লং কাটে যাবো", মামা বললেন।

অগত্যা আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করে পা বাড়ালাম। আমাদের খুঁতখুঁতোনি দেখে মামা বললেন, "কিছ্ছু ভাবিস না তোরা ; আমি এখনও তিন চার মাইল রাস্তা হাঁটতে পারি। তবে

হ্যাঁ, বুড়ো হয়ে গিয়েছি—বাতটাত একটু-আধটু ধরবেই। তা ধরতে দে, সারা জীবন কত লোক হাত ধরল, পা ধরল, কাউকে ফেরালাম না, আর এই বয়েসে বাত বেচারী একটু পা ধরবে তাকে তাড়াই কি করে! ও আমি পারি না! কাউকে বিমুখ করতে আমার বড্ড কষ্ট হয়।”

মামার কথায় আমরা হেসে উঠলাম একসঙ্গে। মনের খুঁত-খুঁতুনি কোথায় যেন ধুয়ে গেল।

মামা যে এখনও বেশ হাঁটতে পারেন তা আমরা জানতাম। আমাদের সঙ্গে তিনি এই শহরের চারদিক ঘুরে বেড়িয়েছেন; ঘুরে ঘুরে সব দেখেছেনঃ কোথায় জঙ্গল, কোথায় গাছপালা, ঝোপঝাড়, রাস্তাঘাট কি রকম, শহরের কোন দিকটা উঁচু, কোন দিক নীচু। এইসব না দেখলে তিনি তাঁর গ্যাস পরিকল্পনাটা করতে পারতেন না। মামা সব দেখেছেন, মনে মনে জরিপ করে ফেলেছেন।......আসলে অন্য সময় হলে মামাকে নিয়ে বেড়াতে আমাদের একটুও মন কেমন করত না; নেহাত ক'দিন ধরে মামা একটু বাতে ভুগছিলেন তাই যা আপত্তি। তাছাড়া আমাদের সরস্বতী পুজোর দিন মামাকে আমরা সুস্থ শরীরে পেতে চাই, নয়ত সব আনন্দই মাটি হয়ে যাবে।

হাঁটতে হাঁটতে মামা বললেন, “চল না, বাজারে গিয়ে টম্‌টম্‌ ভাড়া করব।”

ব্যাস, আমাদের সব দুশ্চিন্তা দূর হল। আর কিছুর ভাবনা নেই। বরং সবাই খুব খুশী। আমাদের শহরে টাঙার খুব একটা চল ছিল না, পনেরো বিশখানা মাত্র টাঙা, ভাড়াও যাচ্ছেতাই। সাইকেলের চলটাই আমাদের এখানে বেশী। সব বাড়িতেই সাইকেল। হয় সাইকেল না হয় পায়ে হাঁটা। দায়ে-অদায়ে টাঙা। টাঙা চড়ার কপাল আমাদের বড় একটা হত না। মামার সঙ্গে টাঙা চড়ে সরস্বতী ঠাকুর পছন্দ করতে যাব ভেবে আহ্লাদে আটখানা হবার যোগাড় আর কি!

মামা টাঙাকে টম্‌টম্‌ বলতেন। কেন বলতেন জানি না। জিজ্ঞেসও করিনি। বরং টাঙা বা টোঙার চেয়ে টম্‌টম্‌ শুনতে ভালই লাগত।

বাজারে এসে মামা বেছে বেছে দুটো টম্‌টম্‌ ভাড়া করলেন। একটাতে মামা, ব্রজ, কানু আর আমি; অন্যটাতে অন্তু, বিজন, হারু, টুনু, মানস-টানস।

টম্‌টমে মামাকে আমরা বেশীটা জায়গা ছেড়ে দিয়ে একপাশে বসিয়ে রাখলাম; ব্রজ একেবারে টাঙাঅলার পাশে গিয়ে বসল।

গাড়ি চলতে শুরু করল। মামা তার চুরুটটা ধরিয়ে নিয়েছেন আগেই। গাড়ির দোলায় আমরা দুলছি; মামাও হেলছেন, দুলছেন, আর থেকে থেকে হেসে ফেলছেন। আমরা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

বার কয়েক আমরা বোকার মতন বসে বসে মামার হাসি দেখলাম। তারপর কানু বলল, "মামা, আপনি হাসছেন কেন?"

গাড়ির দোলায় মামা একটু হেলেদুলে হেসে তারপর ঠিকঠাক হয়ে বসলেন। বললেন, "কাতুকুতু লাগছে রে!"

"কাতুকুতু!" আমি অবাক।

মামা ঘাড় দুলিয়ে বললেন, "হ্যাঁরে, আমার এই এক বিদঘুটে রোগ। ঘোড়ার লেজ দেখলেই আমার কাতুকুতু লাগে, মনে হয় ভুঁড়িতে লেজের সুড়সুড়ি লাগছে।"

মামার কথা শুনে আমরা যতটা অবাক ততটাই যেন মজা পাই। ঘোড়ার লেজটা দেখে নিই একবার, দেখে হেসে ফেলি। ব্রজ ওপাশ থেকে মুখ ঘুরিয়ে আমাদের প্রায় মুখোমুখি হয়ে বসল।

মামা বললেন, "এই রোগের জন্যে আমার আর ঘোড়ায় চড়া হল না। ও-সব দেশে থাকতে, বিশেষ করে তোর রাশিয়ায়, ঘোড়ায় চড়াটা ডাল-ভাত, তোদের সাইকেল চড়ার মতন। আমায় ওরা কতবার ঘোড়ায় চড়া শেখাতে গেছে, জোর করে ঘোড়ার ওপর বসিয়ে দিয়েছে, কিন্তু বসার সঙ্গে সঙ্গে যেই ঘোড়াটা পা

তোলে অমনি আমি হেসে মরি। মনে হয়, কোমরে আর ভুঁড়িতে লেজের সুড়সুড়ি লাগছে। হাসতে হাসতে লাগাম ছেড়ে দিয়ে ডিগবাজী খেয়েছি কতবার যে।···একবার তো উল্টে পড়ে নাকটাই গেল।"

আমরা হাসতে লাগলাম। ব্রজ বলল, "হাসির কোনো পাত্তা নেই।······মামা, আমি একটা লোককে মিরচা খেয়ে খুব হাসতে দেখেছি।"

"মিরচা কি রে? লঙ্কা না মরিচ?"

"লঙ্কা।"

"লঙ্কা খেয়ে হাসে—সে আবার কেমন মানুষ রে। অ্যাঁ?" মামা মজার গলায় বললেন।

ব্রজ জবাব দিল, "কি জানি। তাজ্জব।"

চুরুটে ছোট ছোট ছুটো টান মেরে মামা বললেন, "কার একটা গল্প পড়েছিলাম বিদেশে থাকতে, খাসা গল্প। তা বুঝলি রে ব্রজ, সেই গল্পে একটা জায়গার নাম ছিল আটাশটা অক্ষরে, উচ্চারণই হয় না, ভাওএলগুলো বেমালুম সব বাদ। ছোট করে লোকে বলত, 'ফানি টাউন'। সে শহরে কুকুরেরা একশো বছরেও একটা মানুষকে কামড়ায়নি, নিজেরাও কামড়াকামড়ি করেনি, বেড়ালরা ইঁছুর ধরেনি, মাছ ছুধ ছোঁয়নি, ঘোড়ারা রুটি মাখন ছাড়া ঘাসটাস খেত না; আর একশো বছরেও কোনো মানুষের মুখ ভার, চোখে জল দেখা যায়নি।······"

"আরে সাবাস···" ব্রজ সহর্ষে চেঁচিয়ে উঠল, "কিয়া মজাদার শহর, মামা! কি যেন নামটা?"

"ফানি-টাউন, মজার শহর।"

"আজব দেশ," আমি লাগসই করে বললাম।

কানু বলল, "তারপর মামা?"

"তারপর সে বিস্তর কাহিনী। অত এখন বলতে পারব না। দেখছিস না, খালি সুড়সুড়ি খেয়ে হাসছি!" বলে মামা একটু

হেসে নিয়ে এমনভাবে বসলেন যেন ঘোড়াটার লেজটাই না চোখে পড়ে। বললেন, "ছোট্ট করে গল্পটা বলি শোন।... তা সেই শহরে এক মেয়র ছিল। মেয়র জানিস? কলকাতা শহরে আছে, কর্পোরেশনের মেয়র। তোদের এখানে যেমন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, সেই রকম। ওদেশে পুচকে শহরেও মেয়র থাকে। গালভরা নাম, গদিঅলা চেয়ার, ছিমছাম ফিটফাট অফিস, মেয়রসাহেব আসেন বসেন, সেলাম খান। মজার শহরে যিনি মেয়র তাঁরা চার পুরুষ ধরে মেয়রই হয়ে আসছেন। শেষের দু' পুরুষের কোনো কাজকর্মই ছিল না। থাকবে কি করে? শহরে কিছুই যে হয় না, ভুল করে একটা ইঁদুরও রাস্তায় মরে না। একটা কিছু না হলে মেয়রই বা করবেন কি! তাই মেয়রসাহেব অফিসে বসে শুধু আইসক্রিম খান আর নাক ডাকিয়ে ঘুমোন।...একদিন সেই শহরে এক ভদ্রলোক এল, বলল সে মেয়রসাহেবের শালা।...মেয়রসাহেব বললেন, বেশ বেশ, তা শালাবাবুর উদ্দেশ্যটা কি? শালাবাবু বললেন, তিনি ডাক্তার, এই শহরে ডাক্তারী করতে এসেছেন। কথা শুনে মেয়রসাহেব হেসে গড়াগড়ি। শালাবাবু বলেন কি? এই শহরে ডাক্তারী। আরে, এখানে মানুষ গরু ভেড়া ঘোড়া কুকুর কারও যে কোনো অসুখই করে না। দু-পাঁচটা ডাক্তার যারা ছিল, তারা সব পাততাড়ি গুটিয়েছে।...শালাবাবু তবু বিদেয় হলেন না, বললেন—বেশ তো, পাঁচ-সাত দিন থাকি, তারপর যাব।"

কানু বলল, "মামা, শহরটায় মাথাধরা, পেটের অসুখ থাকা দরকার ছিল।"

"কেন রে?" মামা বললেন, "ও দুটো রোগই বা থাকবে কেন?"

কানু হেসে বলল, "তা না হলে স্কুল কামাই করা যাবে না।"

মামা হোহো করে হেসে একেবারে টমটম্ থেকে গড়িয়ে পড়েন আর কি। আমরাও হেসে উঠেছিলাম। দিব্যি ব্রেন

খাটিয়ে বলেছে কানু।

মামার অট্টহাসি দেখে ব্রজ ঘোড়ার লেজ আরও আড়াল করে বসল।

হাসি থামলে মামা বললেন, "তারপর শোন। যা বলছিলাম। তা ডাক্তার শালাবাবু শহরে থাকতে থাকতেই একদিন মেয়রসাহেব তাঁর সভাসদ—মানে কাউন্সিলারদের এক ভোজ দিলেন। সেই ভোজে শালাবাবুও অতিথি।···খুব খাওয়া-দাওয়া হই-হল্লা হচ্ছে, হঠাৎ শালাবাবু মোটাসোটা নধর গোছের বুড়ো এক কাউন্সিলারকে বললেন—আপনি মশাই অত জোরে জোরে হাসবেন না, দাঁতে ব্যথা হবে। দাঁত ব্যথা? সেটা আবার কি? দাঁতে আবার ব্যথা হয় নাকি? শালাবাবু বললেন—আজ্ঞে হয়; দাঁত বড় প্রয়োজনীয় জিনিস; ভগবানের রাজ্যে এর চেয়ে চমৎকার ও সূক্ষ্ম সৃষ্টি নেই। আপনার দাঁত আমাকে দেখতে দিন। এই বলে শালাবাবু দাঁত দেখার নাম করে খাবার-কাঁটা দিয়ে কি একটা যেন করে দিল। পরের দিন ভদ্রলোকের দাঁতে ব্যথা। তার পরের দিন মাড়ি ব্যথা; শেষে গাল ফুলল। যন্ত্রণায় ভদ্রলোকের মুখটি ভার হল। সেই প্রথম 'ফানি টাউনে' গালফোলা আর মুখভার একটা মানুষ দেখা গেল।

তারপর শালাবাবু ভদ্রলোকের দাঁত তুললেন। দাঁত তোলার আগে শালাবাবু একটা গ্যাস দিতেন, লাফিং গ্যাসের মতন, তবে ঠিক লাফিং গ্যাস নয়, ফলে রুগী অজ্ঞান হত না ঠিক, হাসতে হাসতে ঝিমিয়ে পড়ত। আর শালাবাবু টক করে দাঁতটি তুলে নিতেন।

"শালাবাবু দাঁতের ডাক্তার?" কানু শুধলো।

"তা ঠিক জানি না রে। তা সেই 'ফানি টাউনের' লোক যেই শুনল যে, শালাবাবুর কাছে গেলে চেয়ারে বসে ভীষণ হাসা যায়, অমনি সবাই ছুটতে লাগল। আর শালাবাবু হাসাবার নাম করে দাঁত তোলেন। দাঁত তোলেন আর পাশের দাঁতটা নড়িয়ে দেন;
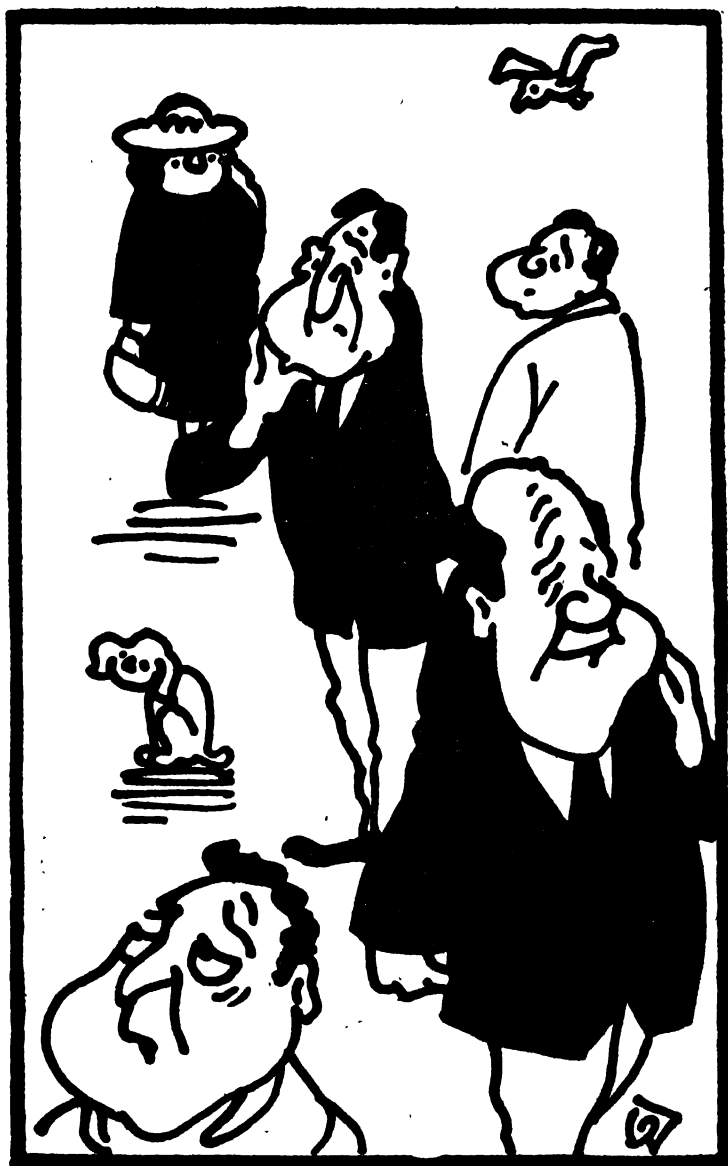
দেখতে দেখতে শহরে খালি গালফোলা লোকের ভিড়...

আবার তোলেন। দাঁত প্রতি দশ টাকা মতন। দেখতে দেখতে শহরে খালি গালফোলা লোকের ভিড়, খালি আঃ আর উঃ! এমন অবস্থা হল যে, ওই শহরে মানুষের আর দাঁত থাকল না। সবাই নির্দন্ত। মেয়রসাহেব তখন শালাবাবুকে ঘাড় ধরে সমুদ্রের ধারে নিয়ে গেলেন। নিয়ে গিয়ে বেশ করে জলে চুবিয়ে তিরিশ-কুকুরে-টানা গাড়ি করে শহর থেকে বিদায় করে দিলেন।"

গল্পটা শেষ হতে হতে আমরা ধোবিতলায় পৌঁছে গেলাম। অন্তু-টন্তুরা অন্য গাড়িতে বসে আমাদের হাসাহাসি দেখে বেজায় চটছিল, যেন আমরা ওদের ভাগ না দিয়ে টাটকা টাটকা কিছু খেয়ে নিলাম।

টম্‌টম্ থেকে নামতে নামতে মামা বললেন, "বুঝলি ব্রজ, লঙ্কা খেয়ে হাসা আর শক্ত কি? কিন্তু নামে লাফিং গ্যাস হলেও লাফিং গ্যাস খেয়ে হাসতে যাওয়া খুবই সাংঘাতিক।"

সরস্বতী ঠাকুর পছন্দ করে আমরা ফিরলাম। সেই টম্‌টম্। অনেকটা পথ আসার পর মামা বললেন, "এবার গাড়ি দুটোকে বিদায় করে দে। চমৎকার লাগছে। চল হেঁটে হেঁটে ফিরি।"

টম্‌টম্ বিদায় করে দিয়ে আমরা সবাই একসঙ্গে ফিরতে লাগলাম। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে প্রায়। বাতাসে শীত আছে, তবু আর কাঁপুনি লাগছে না। দেবদারু গাছের মাথায় অন্ধকার এসে বসছে, পাখির দল ঝাঁক বেঁধে ফিরছে, গাছে গাছে এসে বসছে, মধুবাবুর ফুলবাগানে গাঁদাফুলের ওপর ছায়া নেমে গাঢ় হয়ে গেছে, আকাশে তারা ফুটল দু'একটা, কেমন যেন বুনো ফুলের গন্ধ ভেসে আসছে।

হাঁটতে হাঁটতে মামা এক সময়ে বললেন, "আচ্ছা, এবার কাজের কথা বলি, শোন্। সরস্বতী পুজোর দিন আমি আমার তাঁবুর কাছে—বাগানে একটা মডেল গ্যাস প্লান্ট বসাব। বড়-সড় করে যেটা বসাতে হবে, তার একটা ছোটখাট চেহারা আগে তোদের দেখা দরকার। আমার অ্যারেঞ্জমেণ্ট কমপ্লিট—মানে, কি

কি চাই তা ঠিক করে ফেলেছি। একটা বড় ড্রাম দরকার, গোটা কয়েক টিন, দু-তিনটে মাটির জালাও দরকার হতে পারে, নল-টল আমার কাছে আছে। এখন তোমরা বয়েজ, আমায় কিছু পচা গাছ-পাতা কাঠকুটো এনে দেবে, আর গোবর।"

"গোবর!" বিজন হুট করে বলে ফেলল।

মামা বিজনের দিকে তাকালেন, "তোকে দিয়েও অবশ্য কাজটা চলতে পারে—কিন্তু পুজোর দিন আর তোর মাথার গোবর নিতে চাই না।"

ব্রজ বলল, "মামা, আমাদের গো-মাতার হিসেবটা হয়নি।"

"এখনও হয়নি! কি করছিলি তবে?"

"সরস্বতী পুজোর চাঁদা-টাদা তুলছিলাম," আমি বললাম।

মামা এক মুহূর্ত ভেবে বললেন, "তবে তো ওরই সঙ্গে সঙ্গে এটাও করতে পারতিস। বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলিসনি?"

"হ্যাঁ—বাড়ি বাড়ি গিয়ে তুলেছি—" কানু বলল।

"তবে—!" মামা বললেন, "তবে তো ওই সঙ্গে এটাও হয়ে যেত। যে বাড়িতে চাঁদা চাইতে যাস সে বাড়িতে গরু আছে কিনা, থাকলে ক'টা গরু জেনে নিতে পারিস না? ওটা জানলেই তো মোটামুটি একটা হিসেব বেরিয়ে গেল। তারপর যাবি গোয়ালাদের কাছে, শেষে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে পড়বি। না, তোদের দ্বারা এসব হবে না। একেবারে ছাগল তোরা—!"

আমরা সবাই কেমন লজ্জায় চুপ করে থাকলাম। হঠাৎ ব্রজ বলল, "মামা, এখনও চাঁদা আদায় বাকি আছে। সব লোক চাঁদা দেয়নি, রসিদ কেটে দিয়েছি। কাল থেকে গো-মাতার হিসেব নেব।"

মামা দু' মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, "গুড্, ভেরি গুড্।"

কানু আমতা আমতা করে বলল, "আমরা কি বাড়ি বাড়ি গিয়ে গোবরের কথা বলে আসব, মামা?"

"বাঃ, গুড্ আইডিয়া! ভেরি গুড্!"

৫

অন্তুদের বাড়ির বাগানে মামার তাঁবুর পাশে সরস্বতী পুজোর দিন গ্যাসের মডেল যন্ত্রটা বসানো হল। মামাই বসালেন। আগের দিন থেকেই হাঁকডাক করে বাড়ির চাকরবাকরদের ডেকে মামা কাজ করাচ্ছিলেন, আমরাও পুজোর তোড়জোড়ের ফাঁকে ফাঁকে মামার ফরমাশ খাটছিলাম। একটা ড্রাম এল তেলের, বড় ড্রাম; মাঝারি আরও একটা জোটানো হল, টিন এল কেরাসিন তেলের—খালি টিন, মাটির কলসি, কিছু কাঠকুটো, পচা জঞ্জাল এবং গোবরও।

সন্ধ্যেবেলায় আমরা কিছু গোবর কুড়িয়ে এনে রেখে দিয়েছিলাম।

সরস্বতী ঠাকুরের পায়ে অঞ্জলি দিয়ে আমরা ছুটতে ছুটতে মামার কাছে এসে হাজির। এসে দেখি, যোগাড়যন্ত্র শেষ করে মামা তার মডেল-যন্ত্রের সামনে কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

আমরা আসতেই মামা বললেন, "এই যে, তোদের জন্যেই অপেক্ষা করছি। অঞ্জলি দেওয়া শেষ হয়েছে?"

"হ্যাঁ," সমস্বরে আমরা জবাব দিলাম।

যন্ত্রটার দিকে আঙুল দেখিয়ে মামা বললেন, "কি রকম দেখাচ্ছে বল তো?"

কি রকম যে দেখাচ্ছিল বলা মুশকিল। বাস্তবিক ওর কোনো চেহারা আমরা ঠাওর করতে পারছিলাম না। বাড়ি, গাড়ি,

গরু-মোষ, পাখি, গাছ—এ-সব যা আমরা নিত্য দেখি, তার সঙ্গে যন্ত্রটার কোনো সম্পর্ক ছিল না। চেহারাটা কেমন, কি করে বলব? অবশ্য যন্ত্রের কি কোনো চেহারা থাকে? যন্ত্র তো মানুষ বা পশুপাখি নয় যে, তার একটা চেহারা ভগবান চুপিচুপি ঠিক করে দেবেন। আমরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করছি যখন তখন ব্রজ ফট করে বলল, "দেখতে একেবারে বগলার মতন লাগছে।"

ব্রজর কথা শুনে আমরা অবাক।

বগলা আমাদের স্কুলের জল-পাঁড়ে। মামা ব্রজর দিকে ফিরে তাকালেন, "বগলা? বগলা কি? তুই কী-সব ভাষা যে বলিস বেটা?"

আমাদের স্কুলের জল-পাঁড়ে বগলা মাথায় এত বেঁটে যে, সে জলের মস্ত মস্ত ড্রামের পাশে দাঁড়ালে তাকে ড্রামের বাচ্চা মনে হয়। একেবারে গোল তার চেহারা, ভীষণ মোটা, পা থেকে কাঁধ পর্যন্ত সরলরেখা টানলে কোথাও বেঁকবে না। বগলা হাঁটলে মনে হয় ড্রাম গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। মাথায় চুল নেই বলে বগলা রোদের সময় সোলার হ্যাট পরে। এই হ্যাট সে একবার গুণেন-স্যারের কাছ থেকে পেয়েছিল। কেন পেয়েছিল জানি না।

ব্রজ বলল, "মামা, বগলা আমাদের জল-পাঁড়ে।"

ভেবেছিলাম মামা বোধ হয় রাগ করবেন; কিন্তু তিনি রাগ করলেন না। বললেন, "নিয়ে আসিস তাকে একদিন, দেখব।"

আমরা একটু হাসলাম। বগলাকে দেখলে মামা হেসে মাটিতে গড়াগড়ি যাবেন। তা ছাড়া বগলার কথা? সে কথা যে না শুনেছে সে বুঝবে না। বগলা হাই স্কুলের জল-পাঁড়ে, মাথায় হ্যাট পরে বলে দেশে তার খুবই খাতির। বগলাকে সেখানে কথায় কথায় ইংরেজী বলতে হয়।

ইংরেজীগুলো সে আজ বারো বছর ধরে স্কুলের ছেলেদের কাছে শিখছে। শিখে শিখে এমন রপ্ত করেছে যে আজকাল আমাদের

কাছেই সেই সব ইংরেজী বলে। শুনে আমরা খুব হাসি। হাসার মতনই ইংরেজী ; মরা মানুষও সেই ইংরেজী শুনলে হাসতে হাসতে জ্যান্ত হয়ে উঠবে, কিংবা কে জানে, তেমন জ্যান্ত মানুষ হলে হয়ত হাসতে হাসতে মরেও যেতে পারে।

যাই হোক, যন্ত্র বলতে আমরা চোখের সামনে যা দেখেছি তা হল একটা বড় ড্রাম একটা বাচ্চা ড্রামকে পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে বসে আছে, তার মাথায় একটা ফুটো, ফুটোয় রবারের নল, সেই নল এসে পাশে একটা মুখ-আঁটা কলসির মধ্যে ঢোকানো, সেখান থেকে একটা নল বেরিয়ে পাশে কেরোসিনের মুখঢাকা টিনের মধ্যে, আবার সেখান থেকে নল, আবার কলসি···। আমাদের গ্যাস দেখতেই বেশী আগ্রহ। কই, গ্যাস কই ?

বিজন বলল, "মামা, গ্যাস কখন বেরুবে ?"

মামা একটু বিরক্ত চোখে বিজনের দিকে তাকালেন। বললেন, "এখুনি গ্যাস বেরোবে কি ? যন্ত্রটা কি চালু হয়েছে ?"

যন্ত্রই চালু হয়নি। আমরা অবাক ! আমাদের দোষ নেই, দেখে শুনে আমরা কি করে বুঝব যে যন্ত্রটা হাত-পা গুটিয়ে ঠুঁটো হয়ে বসে আছে। মামারও দোষ নেই। মামা হয়ত আগে আমাদের সে কথাটা বলেছেন, আমরা খেয়াল করে শুনিনি।

একটু তফাতে একটা চুল্লীও করা হয়েছিল। ইঁট আর কাদা দিয়ে। সেই চুল্লীর মধ্যে গুচ্ছের কাঠ। চুল্লীটার ওপর কেরাসিনের টিন, কাদা দিয়ে ফাঁকটাক ঢাকা, টিনের মাথায় আর একটা টিন, তার মাথায় ফুটো করে রবারের নল বসানো। সেই নলটা আবার এপাশে হেলিয়ে কলসির মধ্যে ঢোকানো রয়েছে। বড়ই জটিল ব্যাপার।

ব্রজ বলল, "মামা, যন্তরটা চালু হবে কখন ?"

"হবে", মামা জবাব দিলেন।

মামা তারপর তাঁর বিচিত্র পরীক্ষা-যন্ত্রটার সামনে গিয়ে

দাঁড়ালেন। ওই যে জিনিসগুলো—তেলের ড্রাম, জলের ড্রাম, কেরাসিনের টিন, মাটির বড় বড় কলসি, রবারের পাইপ, পাইপের মুখে ছোট ছোট কাঠের কল ইত্যাদি—এসব মিলিয়ে মিশিয়ে যা দাঁড়িয়েছিল তাকে যন্ত্র বলা যায় কি না তা জানি না। তবে, গ্যাসের পরীক্ষা এ-সবের মধ্যেই হচ্ছে বলে আমরা তাকে পরীক্ষা-যন্ত্র নাম দিলাম।

আমরা পাশাপাশি ড্রিল ক্লাসের সময় যেমন অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়াই সেই ভাবে দাঁড়ালাম।

মামা আঙুল বাড়িয়ে যন্ত্রটার একেবারে গোড়ার দিক দেখালেন। মস্ত ড্রামটা দেখিয়ে বললেন, "ওই ড্রাম, ওর মধ্যে কি হচ্ছে?"

আমরা চুপচাপ।

মামা বললেন, "ওর মধ্যে জঞ্জাল আর গোবর পচানো হচ্ছে। জঞ্জাল পচে যে গ্যাস হবে সেই গ্যাসই আমাদের দরকার।"

কানু বলল, "পচাই গ্যাস!"

মামা বললেন, "একে বলে ডিকম্পোজিসান। পচতে শুরু হলে যে গ্যাস ওর মধ্যে জন্মাবে সেটা ওপরের নল দিয়ে এসে ওই কলসিটার মুখে ঢুকবে, কলসি থেকে যাবে অন্য কলসিটায়, তারপর টিনের মধ্যে। আর ওই যে দেখছিস চুল্লী, ওটা থেকে আমরা কাঠকুটো জ্বালিয়ে একটা আলাদা প্রসেসে গ্যাস বের করে নিচ্ছি। ওই গ্যাস এসে এই গ্যাসটার সঙ্গে মিশছে, মিশে একসঙ্গে টিনগুলোর মধ্যে দিয়ে যাবার সময় পিউরিফাই হচ্ছে, হয়ে শেষ পর্যন্ত ওই জালাটায় গিয়ে জমছে। জালাটা হচ্ছে আমাদের গ্যাস চেম্বার।"

আমরা যেন কতই বুঝলাম, কলকল করে বললাম, "বুঝেছি। একেবারে পরিষ্কার। ওই গ্যাস থেকে বাতি জ্বলবে।"

মামা হেসে বললেন, "জিনিসটা অত সোজা নয় নেফুর দল। এটা হল এক্সপেরিমেণ্টাল স্টেজ্। আসল যেটা করব সেটা করতে

মিস্ত্রী-মজুর, ইঁট, লোহা, পাইপ, ফার্নেস কত কি দরকার হবে। অনেক টাকার ব্যাপার।...তা আর দেরি করে লাভ নেই। আমি কাজ শুরু করে দিই।”

মামা কাজ শুরু করতে যাবেন, এমন সময় ব্রজ বলল, “মামা, এই গ্যাসটার নাম কি ?”

মামা দাঁড়িয়ে পড়ে বললেন, “ডবলু-আর !”

আমরা কিছু বুঝলাম না। মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলাম। মামা বুঝিয়ে দিলেন। বললেন যে, এই গ্যাসের মেটিরিআল হল কাঠ আর জঞ্জাল, মানে উড্ এণ্ড রাবিশ। উডের...

কানু কথাটা লুফে নিয়ে বলল, “উডের ডব্লু আর রাবিশের আর।”

মামা মাথা নাড়লেন। “রাইট্।”

মামা চুল্লীটা জ্বালিয়ে দিলেন। তলার ফাঁক দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরুতে লাগল। আমাদের আর দাঁড়িয়ে থাকার সময় ছিল না। কানুদের বাড়িতেই আমাদের সরস্বতী পুজো হয় বরাবর। সেখানে আমাদের দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে, মাসিমা আর কল্যাণীদি-ই সব ব্যবস্থা করছেন, পুচকে ক'টা ছেলেমেয়ে আছে, ডলিও আছে। তবু সেখানে আমাদের যাওয়া দরকার। তারপর স্কুলেও যেতে হবে একবার। বিকেল থেকে ঠাকুর সাজানো হবে রাত্রের জন্যে। পাড়ার সবাই আসবে। পশুপতিদা ম্যাজিক দেখাবে আজ আমাদের ওখানে।

মামাকে বল্লুম, “মামা, আমরা যাই ?”

মামা বললেন, “হ্যাঁ, তোরা যা। গ্যাস হোক, তারপর জ্বালাব। সে কালকের ব্যাপার।”

সন্ধ্যেবেলায় মন্টুদারা আমাদের ঠাকুর দেখতে এল।

ঠাকুর দেখে বলল, “বাঃ, বেশ সাজিয়েছিস। তা কই, আমাদের কিছু খাওয়া-টাওয়া !”

প্রসাদ ফুরিয়ে গেছে কখন, খাওয়াবার কিছু নেই। আমরা অপ্রস্তুত।

কানু বলল, "চা খাবে! চা-বিস্কুট?"

গেন্নুদা বলল, "ফার্স্ট ক্লাস! নিয়ে আয়। মাসিমাকে জ্বালাবি না তো?"

কানু বলল, "আমি নিজে করে আনছি। কিন্তু গেন্নুদা, তোমায় একটা গান গাইতে হবে।"

গেন্নুদা বলল, "ভাগ্"।

আমরা গেন্নুদাকে ধরে বসলাম। গেন্নুদা বেশ গায়। হাসির গান।

কানু বলল, "পশুপতি আসুক, তখন গান—এখন কি!"

গেন্নুদা যে গান গাইবে তো বেশ বোঝা গেল।

গল্প করতে করতে গেন্নুদা বলল, "হ্যাঁরে, তোদের সেই জাপানী মামার খবর কি? আসবেন না?"

বিজন বলল, "আসবেন। আর খানিক পরে আসবেন।"

"বাড়ির মধ্যে তাঁবু খাটিয়ে করেন কি ভদ্রলোক? পাগল নাকি?"

ব্রজ চটে গেল। বলল, "পাগল-টাগল বলো না।"

মন্টুদা হাসল। "আজ দেখলাম হাঁড়ি কলসি টিন সাজিয়ে বসে আছেন। ব্যাপার কি?"

"গ্যাস হচ্ছে—" ব্রজ বলল। এমন ভাবে বলল যেন সে খুব গোপনে একটা চমকপ্রদ সংবাদ দিচ্ছে।

"গ্যাস!" মন্টুদার চোখ কপালে উঠল।

গেন্নুদা বলল, "গ্যাস কিসের রে? কি গ্যাস? তোদের জাপানী মামা কি সোডা-লেমোনেড তৈরি করবেন?"

ভাগ্যিস অন্তু সেখানে ছিল না, নয়ত কি যে ভাবত!

আমরা বললাম, "না, রাস্তার বাতি জ্বালাবার গ্যাস হবে।"

শুনে মন্টুদা আর গেন্নুদা পরস্পরের মুখের দিকে খানিকটা

বোকার মতন তাকিয়ে থেকে শেষে হোহো করে হেসে উঠল। সে হাসি আর থামতে চায় না।

আমাদের খারাপ লাগল। বিজন আর ব্রজ ভয়ঙ্কর চটল, আমার তো মনে হচ্ছিল চিৎকার করে মামার বিশ্বজোড়া খ্যাতির কথাটা ওদের বলি।

ব্রজ বলল, "হাসছ কেন? বিশওয়াস (বিশ্বাস) হচ্ছে না?"

মণ্টুদা মুখ চাপা দিয়ে বললেন, "এটা কোন্ গ্যাস রে?"

বিজন মুখ-চোখ লাল করে বলল, "ডবলু-আর।"

"ডবলু-আর? সেটা কি?"

আমরা কিছু বললাম না। বরং খানিকটা অবহেলার সঙ্গে মণ্টুদাদের দিকে তাকালাম।

গেনুদা বলল, "তোদের গ্যাস-মামা নির্ঘাত পাগল।"

"পাগল কখনও ফেমাস ম্যান হয় না," আমি বললাম। "মামা বিখ্যাত লোক। পৃথিবীসুদ্ধ তাঁর নাম জানে।"

"আরে ব্বাস্! তাই নাকি? কেন জানে রে?"

"সাইনটিস্ট বলে।"

"যাচ্চলে, আমরাই জানি না। কি নাম?"

"ওআণ্ডার মুখার্জী বলেই লোকে জানে।"

গেনুদা নস্যির ডিবে খুলে নস্যি নিল আঙুলে। বলল, "ভাল কথা। আগে বলিসনি কেন? এমন লোক এ-শহরে এসেছেন। আমরা ভাবতাম ছিটটিট আছে মাথায়। তা ওরকম সাইন-টিস্ট যখন তখন আমরা ওঁকে দিয়ে কত কি করিয়ে নিতে পারি। কি বলিস্, মণ্টু?"

মণ্টুদা হাসল। "তা তো পারিই।"

গেনুদা বলল, "কি দিয়ে গ্যাস হচ্ছে রে?"

"গোবর-টোবর জঞ্জাল দিয়ে, কাঠ পুড়িয়ে।"

"গোবর গ্যাস!" গেনুদা নাকের নস্যি ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, "এ যে দেখছি অরিজিন্যাল ব্যাপার! তাহলে ক'টা খাটাল বসা।

গরু-মোষ রাখ। দুধটা আমাদের দিস, গোবর তোদের।"

আমরা রীতিমত অপমানিত বোধ করলাম। বললাম, "ঠাট্টা করছ?"

গেন্টুদা বলল, "দূর, ঠাট্টা করব কি? শুনে পর্যন্ত মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে।"

এমন সময় অন্তু ছুটতে ছুটতে এসে বলল, "এই শীগগির চল। একটা ষাঁড় ঢুকে পড়েছিল বাগানে—তাড়া খেয়ে গ্যাসের সবকিছু ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়েছে।"

গ্যাস যন্তরের কিছু আর ছিল না। হাঁড়ি জালা ভেঙেচুরে ছত্রাকার..

৬

শুভকাজে বাধা পড়লে সকলেরই মন খারাপ হয়। মামার বেলায় যেটা হয়েছিল সেটা শুধু বাধা নয়, একেবারে লণ্ডভণ্ড ব্যাপার। গ্যাস যন্তরের কিছু আর ছিল না। হাঁড়ি জালা ভেঙেচুরে ছত্রাকার, কেরোসিনের টিনগুলো চ্যাপটা হয়ে তুবড়ে চারপাশে পড়ে আছে, মস্ত ড্রামটা একপাশে গড়াগড়ি খাচ্ছিল, চুল্লী ভেঙে গেছে, রবারের টিউবগুলো টুকরো টুকরো। দেখেশুনে মনে হবে যেন একটা কামানের গোলা-টোলা কোথাও থেকে ছিটকে এসে পড়ে সব তছনছ করে দিয়েছে। অবস্থা দেখে আমাদের বুক ফেটে যাচ্ছিল। মামা একেবারে চুপ, গম্ভীর। বুঝতেই পারছিলাম মামার এত কষ্টের ও পরিশ্রমের জিনিস নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কী রকম দুঃখ পেয়েছেন। মামা আর বাগানে ছিলেন না, একেবারে তাঁর তাঁবুতে ক্যাম্বিসের চেয়ারে এসে বসে পড়েছিলেন, হাতে চুরুট।

আমরা অনেকক্ষণ ভয়ে ভয়ে মামার সঙ্গে কথা বলতেও পারিনি। কি বলব, মামা যেন একেবারে অন্য জগতে চলে গেছেন, কিছু দেখছেন না, সাড়াশব্দ দিচ্ছেন না, মাঝে মাঝে শুধু হাতের চুরুটটা মুখে উঠছিল।

গেনুদা আমাদের সঙ্গেই চলে এসেছিল। যেন মজা দেখার জন্যেই। দেখেশুনে বলল, "এটা বোধ হয় সেই মহাদেবের ষাঁড় রে, নয়ত এরকম দক্ষযজ্ঞ করত না।"

কথাটা তাঁবুর বাইরে মামার কানের আড়ালেই বলেছিল গেনুদা। আমাদেরও মনে হল, গেনুদার কথাটা হয়ত ঠিক।

আমাদের শহরে দশ-পনেরোটা ষাঁড় নিশ্চয় আছে। কিন্তু মহাদেবের ষাঁড় বলতে একটাই। বিখ্যাত ষাঁড়। নামটাও মুখে মুখে রটেছে। দেখতে এমনিতে নিরীহ, গায়ে গতরে মণ আট-দশ, শরীরের অর্ধেকটা কালো, বাকিটা বাদামী। এমন বদমাশ ষাঁড় ভূ-ভারতে আর জন্মেছে কিনা সন্দেহ। মহাদেব বাজারে ঢুকে পড়লে ত্রাহি-ত্রাহি রব ওঠে, বিশ-পঞ্চাশটা লাঠি তৈরী হয়ে যায়। তবু মহাদেবের যদি মর্জি হয়, আলুর বাজার কি তরকারির বাজার তছনছ করে দিতে পারে, রাস্তার ধারের মিষ্টির দোকানের কাঁচ যে কতবার সে ভেঙেছে তার ইয়ত্তা নেই। তা হলেও মহাদেব শান্ত শিষ্ট, বেশ নিরীহ তার চলনটলন। ওরই মধ্যে হঠাৎ সে খেপে যায়। খেপে গেলে সে সত্যিই দক্ষযজ্ঞ করে।

মহাদেবের খেপার কোনো ঠিকঠিকানা নেই; তবে আমরা জানি, বেয়াড়া কিছু দেখলেই তার মেজাজ গরম হয়ে চোখ লাল হয়ে ওঠে। কে জানে, মহাদেব হয়ত এই পাড়ায় আজ এসেছিল, তারপর শেষ বিকেলের দিকে টহল মারার সময় কোনো রকমে তার চোখ পড়ে যায় অন্তুদের বাগানে। মামার তাঁবু দেখেই হোক বা কোনো ফাঁক-ফোকর দিয়ে গ্যাস যন্তর দেখেই হোক, তার তেমন পছন্দ হয়নি, এক ফাঁকে গেট খোলা পেয়ে ঢুকে পড়ে এই কাণ্ড করেছে। যা করেছে সেটা গরু ষাঁড়টাড়রাই করতে পারে—মানুষের মগজ তো তাদের নেই, মামার এই গ্যাস-যন্তরের মূল্য সে কি বুঝবে!

আমরা যখন বিদায় নিলাম তখন মর্মাহত মামা শুধু বললেন, "কাল আসিস তোরা।"

আমরা চলে এলাম।...

পরের দিন অন্তুদের বাড়ি গিয়ে দেখলাম মামা খুব ব্যস্ত। সকাল থেকেই অন্তু আর বাড়ির চাকর দয়ারামকে নিয়ে মামা মস্ত গজ-ফিতে ধরে নানারকম মাপজোপ করাচ্ছেন। মাপজোপটা কিসের আমরা বুঝলাম না, ভাবলাম—আবার নতুন করে যে

যন্তর বসানো হবে তারই মাপটাপ কিছু হবে। কিন্তু মামার মাপ-জোপের কেমন একটা অদ্ভুত ধরন ছিল, গেট থেকে আগের গ্যাস-যন্তরের কতটা দূরত্ব ছিল তার অন্তত পাঁচ রকম মাপ হল, কম্পাউণ্ডের উচ্চতা মাপা হল, ছড়ানো-ছিটানো যন্তরের টুকরো-গুলোরও নানা রকম মাপ হল। তারপর মামা তাঁবু থেকে একটা দূরবীনের মত যন্ত্র এনে অনেক কিছু দেখলেন, শেষে ওই টুকরো-টাকরা মাটি, রবারের টিউবের কয়েকটা অংশ নিয়ে তাঁবুতে ঢুকলেন। এত যে মাপামাপি—সবই কিন্তু মামা একটা লম্বা কাগজে টুকে নিয়েছিলেন।

আমরা কিছুই বুঝলাম না। অন্তুও তেমন কিছু বোঝেনি। তবে আমরা যখন তাঁবুর বাইরে তখন অন্তু বলল, 'ব্যাপারটা মিস্টিরিয়াস...।' 'মিস্টিরিয়াস' কথাটা আমাদের মধ্যে খুব চল ছিল। কিছু না বুঝলেই বলতাম মিস্টিরিয়াস্। কথাটার মধ্যে বিস্ময় থাকত, রোমাঞ্চও থাকত, অন্তত কথাটায় আমাদের বিস্ময় বাড়ত।

সকালের দিকে মামা আমাদের সঙ্গে তেমন কথাবার্তা বললেন না। দেখলাম, তাঁবুর মধ্যে ঢুকে মস্ত এক আতস কাঁচ বের করে তিনি কাজ করতে বসলেন। কুড়োনো টুকরোগুলো নানা ভাবে দেখছিলেন তিনি। বললেন, "সন্ধ্যেবেলায় আসিস, এখন কাজ করব।"

সন্ধ্যেবেলায় ঠাকুর বিসর্জনের পালা। অবশ্য তাতে আমাদের খুব আটকায় না, সাড়ে সাতটা নাগাদ অনায়াসেই আসতে পারব।

রাত্রে মামার কাছে আসতেই মামা বললেন, "বোস।"

আমরা বসলাম।

মামা চুরুট টানছিলেন। খানিকটা সময় চুপচাপ চুরুট টানার পর চোখ চেয়ে বললেন, "বিসর্জন হল?"

আমরা মাথা নাড়লাম। ব্রজ কি বলতে যাচ্ছিল। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে, তার গলা ভেঙে গেছে, ভাঙা গলায় খানিকটা বিচিত্র শব্দ

হল মাত্র।

মামা আবার একটু চুপ করে থেকে বললেন, "অন্তু, ওই যে—ওখান থেকে টর্চটা নিয়ে বাইরেটা একবার দেখে আয়, লোক-জন কেউ আছে কি না।"

মামার কথায় আমরা অবাক। মামার মুখও বেশ গম্ভীর। অন্তু টর্চ নিয়ে বেরিয়ে গেল। আমরা চুপচাপ বসে, পরস্পরের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করছি।

খানিকটা পরে অন্তু ফিরে এল। মামা চোখ তুলে তার দিকে তাকালেন।

অন্তু বলল, "কেউ নেই।"

মামা বললেন, "ভাল করে দেখেছিস?"

হ্যাঁ।"

"গুড্…।" মনে হল মামা সন্তুষ্ট হয়েছেন। তারপর সামান্য চুপচাপ থাকার পর বললেন, "এবার থেকে আমাদের খুব সাবধান হতে হবে। কথাবার্তায় কাজে আমরা যদি কেয়ারফুল না হই, আবার এ রকম কাণ্ড ঘটবে।"

মামার মুখ দেখে এবং কথার ধরন থেকে আমরা কেমন রহস্যের ছোঁওয়া পেলাম। অথচ ব্যাপারটা বুঝলাম না।

মামা হঠাৎ শুধোলেন, "কাল তোদের সঙ্গে যে ছেলেটা এসেছিল ওই ছেলেটা কে? ওকে তো আমি দেখিনি আগে? তোদের চেয়ে বয়সে ঢের বড়।"

কাল আমাদের সঙ্গে গেনুদা এসেছিল। কানু বলল, "আমাদের সঙ্গে গেনুদা ছিল!"

"গেনুদা! গেনুদাটা কে?"

জবাবটা আমরা ঠিক মতন দিতে যেন ভুলে গেলাম। আমি বললাম, "গেনুদা আমাদের পাড়ায় থাকে। পাড়ার ছেলে, দাদা।"

"কি করে?"

"কিছু করে না, মামা। গেনুদা হাসির গান গাইতে

পারে ভাল।"

"লেখাপড়া কতদূর করেছে ?"

"কলেজ পর্যন্ত, বি এ পরীক্ষা দেয়নি ?"

"কলেজ ? কোন কলেজ ?"

"পাটনায় পড়েছিল।"

"ও! তা কিছু করে না কেন ?"

"কি জানি!"

"বাড়িতে কে কে আছে ?"

"সবাই আছে। বাবা মা দাদা···। গেনুদার বাবা সাহেবদের ক্লাবের ম্যানেজার।"

মামা যেন তাঁর চোখ দুটোকে টপ করে তুলে আমার চোখের ওপর আটকে ফেললেন। খানিকটা সময় আর কথা নেই। তারপর বললেন, "ব্যস, আর বলতে হবে না। একটা আঁচ পাওয়া যাচ্ছে।"

মামা যে কি ভাবছিলেন আমরা জানি না, বোকার মতন তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

মামা তাঁর নিবন্ত চুরুট ধরিয়ে এবার বেশ গুছিয়ে বসে নিচু গলায় বললেন, "বয়েজ, ব্যাপারটা খুবই দুঃখের, কিন্তু এটা প্রায় ঠিকই যে আমাদের পেছনে শত্রু লেগেছে।"

শত্রু! আমাদের পেছনে শত্রু লেগেছে ? কথাটা শোনামাত্র ভাল কিছু বুঝলাম না, তারপর যেন মানেটা আস্তে আস্তে বুঝতে পেরে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাতে লাগলাম। অজ্ঞাত শত্রুর কল্পনায় সামান্য রোমাঞ্চ হল।

ব্রজ বলল, "মামা শতরু লেগেছে ? কোন্ শতরু ?"

কানু বলল, "শত্রু লাগবে কেন ?"

মামা হাতের চুরুটটা কানুর দিকে বাড়িয়ে বার কয়েক বাতাসে প্রশ্নচিহ্নের মতন নাড়লেন, অর্থাৎ কেন, কেন, কেন—এই কথাটাই যেন জোরে জোরে শুধোলেন নিজেকেই। তারপর বললেন, "এ ধরনের ঘটনা অহরহ ঘটে, বিদেশে তো হামেশাই।

তোরা বলবি, কেন ঘটে? জবাবে আমি বলব, কিছু মানুষের এই রকমই মনোবৃত্তি। তারা কেউ স্বার্থের জন্যে, কেউ পয়সার লোভে, কেউ কীর্তির আশায় অন্যের পরিশ্রম, সাধনা চুরি করে। জার্মানীতে জু-দের অনেক সাধারণ বিজ্ঞানীর কীর্তি জার্মানরা চুরি করেছে, তা জানিস!···ব্যাপারটা খুব এলাহিভাবে বিদেশে চলে, বিস্তর পয়সা খরচ করে অন্যের গবেষণা চুরি করাও হয়, তবে এ-সব বেশী চলে যেখানে পয়সা সে-সব জায়গায়। নতুন ওষুধ-বিষুধ আর এঞ্জিনিয়ারিংয়ের বেলায়। ফরমুলা চুরি, প্ল্যান চুরি এসব ওখানে ডালভাত। যুদ্ধের সময় কে কী নতুন জিনিস বের করছে মানুষ মারার জন্যে, তা নিয়ে চুরির হিড়িক পড়ে যায়। সে-সব গল্প শুনলে তোদের গায়ে কাঁটা দেবে। যাক্‌গে, তবু একথা ঠিক, বিদেশে আমরা কাজ করেছি ল্যাবরেটরীতে, ইউনিভার্সিটিতে, কিংবা ধর গভর্নমেণ্টের ব্যবস্থার মধ্যে। সব সময় একটা প্রটেকশান থাকত, চাকর-বাকর, দারোয়ান-পাহারাদারের অভাব ছিল না। পেন্সিলে লেখা একটা চিরকুটও খোয়া যাবার ভয় ছিল না। ওরই মধ্যে অবশ্য বড় বড় চুরিও হয়েছে। আমার বেলাতেই হয়েছিল একবার, তবে চোর ধরা পড়ে গিয়েছিল। সেটা হল তোর ম্যাগ্‌নেটিক রিঅ্যাকশান্ নিয়ে। চোর ঘরে পা দিতেই চারপাশে ঘন্টি বেজে উঠল অটোমেটিক। চোর ধরা পড়ে গেল।"

মামা থামলেন একটু। আমরা রীতিমত রোমাঞ্চ বোধ করতে লাগলাম।

বিজন বলল, "মামা, আমাদের শত্রু কে?"

মামা চশমাটা খুলে ফেললেন। বললেন, "তার আগে প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের যে শত্রু আছে তার প্রমাণ কি?"

ঠিক। মনগড়া শত্রুর কোনো মানেই হয় না। আমাদের যে শত্রু আছে তার প্রমাণ কি? আমাদের চোখের প্রশ্ন যেন মামা বুঝে নিয়ে আবার বললেন, "আমি অঙ্ক কষে বুঝিয়ে দিতে পারি, গতকাল এখানে যা হয়েছে তার মধ্যে একটা প্ল্যান ছিল?"

বিজন আর কানু আমার দিকে তাকাল। আমি অন্তুর দিকে।

"অকারণে একটা সন্দেহ করা ঠিক নয়—" মামা বললেন। "প্রথমটায় আমিও ভেবেছিলাম এটা একটা অ্যাকসিডেন্ট, ষাঁড় ঢুকে পড়ে এরকমটা করেছে। পরে আমার মনে হল, না—দৈবাৎ এটা হয়নি। একটা ষাঁড় বাইচান্স বাগানে ঢুকে পড়লেই চারপাশে ভূমিকম্প হতে পারে না।"

"ভূমিকম্প?" আমি চমকে উঠে বললাম।

"ওটা কথার কথা, ভূমিকম্প হয়নি, তবে অবস্থাটা ভূমিকম্পের মতন। আমি প্রত্যেকটা খুঁটিনাটির কথা ভেবেছি, কোনটা কোথায় ঠিকরে পড়েছে, কি অবস্থায় পড়েছে, তার মাপজোপ করছি, টুকরোর চেহারাগুলো পরীক্ষা করছি। সব দেখেশুনে আমার মনে হচ্ছে এটা ষাঁড়ের কীর্তি নয়, একটা ব্লাস্টিং ঘটানো হয়েছে, মানে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে।"

ব্রজ বলল, "মামা, মহাদেওকা ষাঁড় ভীষণ শয়তান।"

"নো নো—" মামা, মাথা নাড়লেন, "ষাঁড় শয়তান হলেও তার পক্ষে আগাগোড়া সব নষ্ট করা সম্ভব নয়। ষাঁড় গবাদি প্রাণী, তার সেন্স আছে। তাছাড়া ষাঁড়ের মাথায় এত জোর থাকে না—যাতে প্রত্যেকটা জিনিস এভাবে ছিটকে পড়বে। ষাঁড়টা ঢুকিয়ে দিয়ে একটা লোক-ঠকানো ব্যাপার করা হয়েছে।"

বিজন যেন সবই বুঝল, বুঝেও বলল, "মহাদেবের ষাঁড় ভীষণ পাজী, তার গোঁ ভীষণ মামা, ওর অসাধ্য কিছু নেই।"

মামা বললেন, "ষাঁড়টার মেজাজ খারাপ হবার কোনো কারণ নেই। সন্ধ্যেবেলা তার চোখে এত জ্যোতিই বা ঠিকরোবে কোথা থেকে যে, ওই জন্তুটা বাগানে ঢুকে সব দেখেশুনে এভরিথিং তছনছ করবে?"

যুক্তিটা অকাট্য যেন। আমার অবশ্য মনে হচ্ছিল, মহাদেব হয়ত মামার ওই বিচিত্র গ্যাস্ যন্তর দেখেই খেপে গিয়েছিল। এমন বিদঘুটে জিনিস ওর জন্মেও দেখেনি। দেখবেই বা কোথা থেকে!

আমরা মানুষ হয়ে যা দেখলাম না, ও জন্তু হয়ে সেটা দেখবে!

মামা হঠাৎ বললেন, "ওই গেনু ছোঁড়া কেন এসেছিল সেদিন? হোয়াই?"

আমরা যেমন চমকে উঠলাম, তেমনি অবাক হয়ে গেলাম। গেনুদা আমাদের সরস্বতী ঠাকুর দেখতে গিয়েছিল, সেখানে মামার কথাও উঠেছিল। অবশ্য গেনুদা সেদিন মামাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশাই করেছে, আমাদের তা ভাল লাগেনি। মণ্টুদাও ওখানে ছিল গেনুদার সঙ্গে, আমাদের খুব ঠোক্কর মেরেছে, কিন্তু মণ্টুদা আমাদের সঙ্গে ছুটে মামার কাছে আসেনি।

ব্রজ বিস্তারিত করে সব কথা বলল। —মণ্টুদা আর গেনুদা আমাদের ওখানে কখন গিয়েছিল, কি কি কথা বলেছে, কত রকম তামাশা করেছে, গ্যাস যন্তরটাও তারা দেখে গিয়েছিল।

মামা গভীর মনোযোগে সব শুনলেন। তারপর বললেন, "গেনু ছোঁড়া দেখতে এসেছিল অবস্থাটা কি রকম দাঁড়িয়েছে।"

আমি বললাম, "কিন্তু মামা, যে সময় ষাঁড় ঢোকে তখন তো গেনুদারা আমাদের ওখানে—সরস্বতী ঠাকুরের কাছে।"

"ওটাই তো চালাকি! একে বলে অ্যালিবি—বুঝলি। সোজা কথায়—চোখে ধুলো। মানে চুরি যখন এ বাড়িতে হচ্ছে, চোর তখন বাজারে রসগোল্লা খাচ্ছে—এরকম একটা প্রমাণ রাখতে পারলে কে ধরে! যাক গে, গেনু হয়ত দোষী নয়—কিন্তু সে শত্রুপক্ষের লোক, খোঁজখবর রাখে, ইন্‌ফরমেশান দিচ্ছে।"

"শত্রু কে?" কানু জিজ্ঞেস করল।

"ঠিক জানি না। গেনুটেনুর মাথায় অত বুদ্ধি নেই যে শত্রুতা করবে। ওদের বিদ্যে ঘোড়ার পাতা পর্যন্ত। আমার মনে হচ্ছে, এই শত্রুতা করছে সাহেবরা। তাদের পাড়ায় গ্যাস জ্বলবে না—জ্বলবে ইণ্ডিয়ানদের পাড়ায়, এটাতেই তাদের মানে লাগছে। সাহেবগুলোকে এই জন্যেই আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না। হতচ্ছাড়া পাজীর দল।"

মামার কথায় আমাদের হঠাৎ যেন বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল, তবে গেনুদাকে আমরা তখনও তেমন দোষী ভাবতে পারছিলাম না। আবার যখন মন্টুদা আর গেনুদার কথাবার্তা, তাদের রসিকতা, তামাশা মনে পড়ছিল তখন কেমন সন্দেহ হচ্ছিল।

ব্রজ বলল, "আমাদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলায় জেতার জন্যে যারা ঘুগনির সঙ্গে সিদ্ধি মিশিয়ে দেয়, সেই মন্টুদারা সব পারে। এটাও গেনুদারা পারে, কেননা—মামা আমাদের, তাদের নয়।"

মামা বললেন, "ষাঁড় নিমিত্তমাত্র, ওটা একটা লোক-ঠকানো ব্যাপার। আসলে আমার সন্দেহ হচ্ছে, খুব হাল্কা শব্দের একটা বোমা ওই জায়গায় রাখা হয়েছিল। শব্দটা আমরা ঠিক শুনতে পাইনি, তবে ওরা ওদের উদ্দেশ্য সফল করেছে। বোমাটা কায়দার বটে।"

আমরা নীরব। এত বড় একটা বোমার ষড়যন্ত্র ঘটে গেছে জেনে গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল।

শেষে মামা বললেন, "যাই হোক বয়েজ, আমি ওআণ্ডার মুখার্জী," এসব ছোটখাটো ব্যাপারে আমার ভয় হয় না, আমি হতাশ হই না। গ্যাস আমি করবই। আমি যে গ্যাস-বাতি জ্বালাতে পারি তার একটা প্রমাণ তোদের এবারে দেখাই।"

মামা এবার উঠে তাঁবুর মধ্যে অন্য ঘরে ঢুকে গেলেন। তারপর তিন-চারটে বিচিত্র কায়দার যন্ত্র আনলেন, পাইপ আনলেন, সেগুলো সাজালেন। যন্ত্রগুলো নানা ধাঁচের— কোনোটা ফোটো তোলার যন্ত্রের মতন দেখতে, কোনোটা রাস্তায় যে বায়োস্কোপ দেখি ফোকরে চোখ দিয়ে—সেই রকম। একটা কার্বাইডের বাতির চোঙের মতন লম্বা চোঙ আনলেন, ভাঙা পেট্রম্যাক্স বাতির একটা অংশ এল, মামা নানা রকম টুকটাক কাজ সারলেন, তারপর পাইপের নল খুলে দেশলাই জ্বালতেই পেট্রম্যাক্সের ম্যাণ্টেলে ধব্ করে আলো জ্বলে উঠল। আলোটা লালচে।

আমরা সবাই একসঙ্গে হাততালি দিয়ে উঠলাম। মামা বললেন,

দেশলাই জ্বালতেই...ধব্ করে আলো জ্বলে উঠল।

"না না, হাততালির কিছু নয়, এটা হল অন্য প্রসেস, কেরোসিন প্রসেস। আমার গ্যাস তো জ্বালানী গ্যাস। তবে ব্যাপারটা এই রকমই। ওই যে ম্যাণ্টেল, ওটাই হল আসল, শুধু বার্নার জ্বালিয়ে লাভ নেই, তাতে তেমন আলো হয় না, ইন্ক্যানডেসেণ্ট ম্যাণ্টেল, থোরিয়াম দিয়ে এই সূতীর ম্যাণ্টেল তৈরী করতে হয়।…এখানে আমরা ম্যাণ্টেল পাব কোথায় ?"

সমস্যাটা আমরা বুঝলাম না, কিন্তু রীতিমত ভাবনায় পড়লাম।

মামা বললেন, "পরের ব্যাপার পরে—আপাতত আমার হাতে ক'টা কাজ রয়েছে। প্রথম হল, আমি একটা বাড়ি ভাড়া করতে চাই ফাঁকায়, মোটামুটি মাথার ওপরে চাল থাকলেই হল, সেখানে আমার যন্ত্র বসাব। দু' নম্বর হল, একটা নেপালী দরোয়ান চাই, গার্ড। তিন নম্বর হল, তোদের মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে কথাবার্তা বলতে হবে, আইনের ব্যাপার আছে। নাম্বার ফোর হল, তোমরা কারও কাছে কোনো কথা কোনোদিন বলবে না। আর পাঁচ নম্বর হল, গেনুটেনুর সঙ্গে মিশবে না।"

৭

কয়েকটা দিন বাড়ির খোঁজে কাটল। আমাদের পাড়ার বেশীর ভাগটাই ছিল রেলের কোয়ার্টার, অল্প কিছু এমনি বাড়ি। ভাড়া বাড়ি প্রায় ছিলই না। বাজার পাড়ায় দু'একটা গুদোম গোছের বাড়ি পড়ে ছিল, আর ছিল জোড়া-ফটকের দিকে তিন-চারটে বড় বড় বাড়ি। কোনোটাই মামার পছন্দ নয়, আমাদেরও ভাল লাগল না। কাছাকাছি একটা বাড়ি না হলে কি হয়? মামার অসুবিধে, আমাদেরও ভীষণ অসুবিধে।

শেষ পর্যন্ত ব্রজর মাথা থেকে একটা বুদ্ধি বেরুলো। ব্রজ বলল, "মামা, আমরা রুটিসাহেবের পুরনো কারখানাটা নিতে পারি।"

রুটিসাহেব মানে আমাদের পেশরানজি সাহেব। পেশরানজি সাহেব তার পাঁউরুটি বিস্কুটের প্রথম কারখানা খুলেছিল আমাদের পাড়ার দিকেই, খোলার চালের একটা ছোটখাট বাড়িতে। তার একদিকে ঢালু মাঠ, অন্যদিকে মল্লিক ডাক্তারদের বাগান। কারখানার অবস্থা খানিকটা ভাল হয়ে যাবার পর রুটিসাহেব সে-বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্য জায়গায় চলে গেছে। বাড়িটা তারপর থেকে বরাবর খালিই পড়ে ছিল, ও-বাড়ির যা চেহারা কেউ আর ওদিকে মাড়াত না।

ব্রজর কথাটায় আমরা তেমন পাত্তা দিইনি প্রথমে, কিন্তু মামা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, "চল, আজ বিকেলে বাড়িটা দেখে আসি।"

বিকেলে মামাকে নিয়ে আমরা বাড়ি দেখতে গেলাম। আমাদের পাড়ার গায়ে গায়ে বাড়ি, অন্তদের বাড়ির বেশ কাছা-কাছি। বটতলার পর একটা সরু রাস্তা, নুড়ি পাথরের, তার ওপাশে রুটির কারখানা। রাস্তাটা এঁকেবেঁকে সোজা মাঠে নেমে গেছে, মাঠের একদিকে ছোট রেলের লাইন, অন্যপাশে ময়লা পোড়াবার চুল্লি। দু-চারটে গাছ বাড়ি ঘেঁষে। বাড়িটা ছোট, মাথার ওপরকার খোলার চালে ঢেউ খেলে গেছে, পাঁচিলের গায়ে মস্ত

কাঠচাঁপা গাছ। বাইরে থেকে বাড়িটা দেখে মামা অনেকক্ষণ কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, “কার বাড়ি ?”

কানু বলল, “হাকিমবাবুর।”

মামা বললেন, “ঠিক আছে ; কথা বলতে হবে।”…

ওই বাড়িটাই মামা ভাড়া করে ফেললেন। নগদ দশ টাকা ভাড়া।

বাড়িটা ভাড়া করার পর মামা বাড়ি সারাই নিয়ে পড়লেন। প্রথমে রুটি কারখানার যত জঞ্জাল সাফসুফ করা হল, মাথার ওপরের চাল নুয়ে এসেছে অনেক জায়গায়, তার মেরামতি হতে লাগল, দেওয়ালগুলোয় উই ধরেছিল, উই পরিষ্কার করে দেওয়ালের আধখানা আলকাতরা লাগানো হল। যেমন গন্ধ তেমনি ঝাঁঝ। বাড়িটায় দুটো মাত্র ঘর, ঘরের গা ঘেঁষে ঢাকা-বারান্দা। বারান্দার ডান পাশে একটা ছোট্ট চালা। চালাটা ভেঙে পড়েছিল। মামা সেটাও দাঁড় করিয়ে নিলেন। জানলার ওপর জাল আটকানো হল, আর বাইরের বারান্দার আগাগোড়া ঢেকে দেওয়া হল তারের পাতলা জালি দিয়ে। কানু বলল যে, তার খরগোশের বাক্সে এইরকম জাল ছিল।

কথাটা মামার কানে গিয়েছিল, বললেন, “এটা তোর খরগোশের বাক্স নয়, এ হল গ্যাস রিসার্চ সেন্টার।”

কানু বেচারা মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, “হ্যাঁ মামা, গ্যাস গবেষণা…,” কথাটা আর শেষ করতে পারল না। মনে হল, গবেষণার পাশাপাশি একটা বসাবার মতন কথা সে খুঁজে পেল না।

বাড়িটাকে যে এত জালটাল দিয়ে ঘিরে ফেলা হল, তার কারণ সাবধানতা ; আমরা সেটা জানতাম। মামাও আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, শত্রুকে কখনো অবহেলা করতে নেই, ছোট করে দেখতে নেই। আমাদের শত্রু যে কে বা কারা তা জানা না থাকলেও, এবার সকলেই বেশ সাবধান হয়ে গিয়েছিলাম। যেখানে-সেখানে দুমদাম কথা বলতাম না, গেনুদাদের সঙ্গে চোখাচোখি হলে

এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতাম। বিজন রবার্ট ব্লেক সিরিজের অনেকগুলো গোয়েন্দা বই পড়েছিল বলে সে আমাদের রবার্ট ব্লেক হয়ে গেল, আর ব্রজ হল ব্লেকসাহেবের অ্যাসিসটেন্ট স্মিথ। অবশ্য ব্রজ স্মিথ-টিথ বুঝত না। না বোঝার দরুণ সে আমাদের গ্যাস গবেষণা বাড়ির, বা বলা যাক—গ্যাস গবেষণা ভবনের কাছাকাছি যাকেই হাঁটাচলা করতে দেখত, তার ওপরই সন্দেহ করত। একদিন তো রেলের লোয়ার প্রাইমারি স্কুলের অঙ্কের মাস্টারমশাই গোবিন্দবাবুকে বিকট শব্দ করে ভয় দেখিয়ে প্রায় অজ্ঞান করে ফেলেছিল। দোষ অবশ্য ব্রজর ততটা নয়, সন্ধ্যেবেলায় অন্ধকারে গোবিন্দবাবু মাথায় বাঁদর-টুপি পরে ওই রাস্তা দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন, ব্রজ ভাল মতন ঠাওর করতে পারেনি। সামান্য ভুলচুক হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ব্রজ কাউকেই বাদ দিত না, মোমফালিঅলা, ঘুগনিঅলা, কেদার ধোপা, মদন মালী— সকলকেই রীতিমত নজরে রাখত।

মামা বাড়িটার মেরামতি শেষ করে চারদিকে জাল দিয়ে ঘিরে ফেলার পর অন্য আর পাঁচটা কাজে হাত দিলেন। তাঁর তাঁবু থেকে সেই সব বিচিত্র যন্ত্রপাতি আসতে লাগল, ইট আর মাটি দিয়ে দুটো বড় বড় যজ্ঞের উনুন তৈরী হল বারান্দার কোণ ঘেঁষে টিনের শেডের তলায়, ড্রাম এল বড় বড়, মাটির জালা এল, কেরাসিনের টিন, আরও কত কি। দুটো ঘরের একটার দরজার ওপর মামা লাল রঙ দিয়ে লিখে দিলেন—'প্রোটেকটেড্ প্লেস : নো অ্যাডমিশান', আর অন্য ঘরটার মাথায় লেখা থাকল : 'ল্যাবরেটরী'। প্রথম ঘরটায় মামা তাঁর গ্যাস তৈরীর যন্ত্রপাতি সাজাতে লাগলেন, আর দ্বিতীয় ঘরটায় থাকল আর পাঁচ রকমের সরঞ্জাম, কাগজপত্র, টেবিল-চেয়ার।

বীর বাহাদুর নামে একটা নেপালী পাওয়া গিয়েছিল, বুড়ো গোছের। অন্তুর বাবা—নৃপেন জ্যাঠামশাইয়ের অফিসে কাজ করত সে একসময়ে। তাকে মামা চৌকিদার করে রেখে দিলেন। ব্রজ কোথা

থেকে একটা শেয়াল টাইপের খেঁকি কুকুর জুটিয়ে আনল ; বলল, "মামা, এই কুত্তা দিনরাত ওয়াচ্ দেবে ; খুব চেল্লায়।"

নতুন করে গ্যাস গবেষণার সব রকম ব্যবস্থা করতে করতে শীত প্রায় যাই-যাই করছিল। আমাদের ওদিকে শীতটা সহজে যেত না, পাকা কাবাডি খেলুড়ের মতন দম টেনে একবার এদিক একবার ওদিক দৌড়োদৌড়ি করত।

কাঁচা কাজে আর হাত দেবেন না বলেই মামা এবার একটু সময় নিয়েছিলেন, চারদিক বেঁধেবুধে পাকা কাজে হাত দিলেন এবার। গ্যাস যন্তর চালু করার আগের দিন আমাদের একটা সিক্রেট মিটিং হল, মামাই মিটিং ডেকেছিলেন সন্ধ্যেবেলায়।

আমরা সবাই ঠিক সময়ে যথাস্থানে হাজির হলাম। মামার অফিস-ঘরে মিটিং। মিটিংয়ের আগে বাড়িটার চারদিকে একবার টহল মেরে এল বিজন আর ব্রজ। নেপালী চৌকিদার বীর বাহাদুর থাকল সদরে দাঁড়িয়ে। আর ব্রজর সেই খেঁকি কুকুর—যার নাম দিয়েছিল ব্রজ 'টাইগার'—সেই টাইগার থাকল বারান্দার নীচে দড়ি-বাঁধা। অনবরত সে চেঁচাতে লাগল।

পেট্রম্যাক্স নয়, ডিজ্ ল্যাম্প নয়—একেবারে মিটমিটে লণ্ঠন জ্বালিয়ে আমাদের মিটিং বসল, কেননা ওটা সিক্রেট মিটিং।

মামা বললেন, "বয়েজ, আজকের মিটিংয়ে তোমাদের কাছে আমি খোলাখুলি ক'টা কথা বলতে চাই।"

আমরা হাত-পা টান করে বসলাম ; কান খাড়া থাকল। ব্যাপারটা যে বেশ গুরুগম্ভীর হতে চলেছে এটা বোঝাই যাচ্ছিল।

মামা তাঁর হাতের চুরুট দাঁতে চেপে ধরে সেটা ধরিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, "কোনো বড় কাজ সহজে হয় না, বাধা আসে। আমার অনেক বয়েস হয়েছে, নানা দেশে নানা রকম কাজ আমি করেছি ; আমি জানি বাধা-বিপত্তি আসবেই। কাজেই যা হয়েছে তা মনে করে বসে থাকলে চলবে না। আমরা তা থেকে শিক্ষা নিয়েছি আর সেই শিক্ষা মতন কাজ করেছি। শিক্ষাটা কি ?"

হুট করে নন্তু বলল, "সাবধান হওয়া।"

মাথা হেলিয়ে মামা বললেন, "ইয়েস। এসব কাজে কেয়ারফুল হওয়া উচিত; যা করার গোপনে করা দরকার। তা আমরা এবার সেটা যথাসাধ্য করেছি। ঠিক কি না?"

আমরা সকলে মাথা নেড়ে বললাম, "ঠিক ঠিক।"

মামা আচমকা বললেন, "সেই গেনুর খবর কি?"

ব্রজ কিছু বলতে যাচ্ছিল, বিজন ব্রজকে থামিয়ে দিল, যেন রবার্ট ব্লেক সামনে থাকতে স্মিথের কিছু বলা মানায় না। বিজন বলল, "গেনুদার চিকেন হয়েছে।"

"কি?"

"চিকেন-পক্স।"

"ক'দিন হল ভুগছে?"

"চার-পাঁচ দিন।"

"তার আগে ওই গেনু কোনো খোঁজখবর করেছে?"

"করেছিল।"

মামা সন্দেহের চোখে তাকিয়ে থাকলেন। "কি খোঁজ-খবর?"

"এই বাড়িটা ভাড়া নেবার কথা জিজ্ঞেস করছিল। আমি বলেছি, বাড়িটা মামা ভাড়া নিয়েছেন কেক বিস্কুট তৈরী করাবেন বলে…।"

মামা ব্রজর দিকে তাকালেন। যেন আরও বিস্তারিত খবর চান।

ব্রজ প্রথমটায় একটু তোতলা হয়ে গেল, তারপর বলল, "গেনুদাকে ডর করবেন না মামা, টাইগারকে রেডি করে রেখেছি। গেনুদা ঘেঁষতে পারবে না। চেচাক বেমারী হয়েছে।"

মামা যেন তেমন কিছু ভরসা পাচ্ছিলেন না। বললেন, "গেনুর ব্যাপারটা বড় নয়—তার পেছনে কেউ থাকতে পারে। সেদিন আমি একটা লোককে দেখলাম, এই বাড়িটার আশে-

জগা পাগলা মাঝে মাঝে খাকি হাফ প্যাণ্ট, গলাবন্ধ রেলের কোট, জুতো-মোজা পরে এক জোড়া লাল-সবুজ ফ্ল্যাগ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

পাশে ঘুরঘুর করছে।”

বিজন চমকে উঠে বলল, “কে লোক? কেমন দেখতে মামা?”

মামা লোকটার যা বর্ণনা দিলেন তাতে মনে হল, জগা পাগলা। জগা পাগলা মাঝে মাঝে খাকি হাফ প্যাণ্ট, গলাবন্ধ রেলের কোট, জুতো-মোজা পরে এক জোড়া লাল-সবুজ ফ্ল্যাগ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। রাস্তার মাঝখানে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে সিগন্যাল দেয়, হুইসল বাজায়। জগা পাগলা লাল ফ্ল্যাগ তুলে রাখলে তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া বড় ঝঞ্ঝাটের। ছেলেবেলায় আমরা তো তাকে ভয়ই পেতাম। লোকে বলে, গাঁজা খেয়ে খেয়ে জগা পাগলার মাথার ওই অবস্থা। এখনও জগা পাগলা গাঁজা খায়।

কানু বলল, “মামা, ও হল জগা পাগলা।”

মামা বললেন, “পাগল হতে পারে। কিন্তু পাগলদেরও চোখ কান আছে।”

বিজন বলল, “জগা পাগলার জন্যে আপনি ভাববেন না মামা; আমরা ওকে দেখব।”

মামা এবার অন্য কথা পাড়লেন। বললেন, “আমি একদিন তোমাদের মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে যাব ভেবেছিলাম। শেষে দেখলাম, এখন গিয়ে লাভ নেই। আগে থেকে জানাজানি হয়ে গেলে আমাদের এনিমি ক্যাম্পের সুবিধে হবে। তার চেয়ে গ্যাস এক্সপেরিমেণ্টটা আগে সাকসেসফুল হোক, তখন যাব। কি বলো?”

আমরা মাথা নাড়লাম—সেটাই ঠিক।

এবার মামা সরাসরি গ্যাসের কথায় এলেন। বললেন, “কাল সকালে আমার গ্যাস প্ল্যাণ্ট চালু করব। একেবারে কাঁটায় কাঁটায় হাফ্ পাস্ট সেভেনে। পাঁজি দেখে সময়টা ঠিক করে নিয়েছি। অবশ্য পাঁজিটাজি আমি মানি না। লিলি বেটি জোর

করে আমায় পাঁজি ধরিয়ে দিল।”

আমাদের মনে হল, লিলিদি কাজটা ভালই করেছে। এমনিতে তো লিলিদি, জ্যাঠাইমা—এরা মামার এই বাড়িভাড়া নেওয়া, যন্ত্রপাতি বসানো এ-সব নিয়ে মুখ টিপে হাসে, আমাদের খেপায়, একটু-আধটু রাগটাগও করে মামার ওপর। এখন অন্ততঃ লিলিদি কাজটা ভালই করেছে।

মামা হাত বাড়িয়ে টেবিলের ওপর থেকে একটা ফাইল তুলে নিলেন, পাতা ওল্টালেন পর পর, শেষে বললেন, “আমার হিসেব মতন এবার গ্যাস হতে লাগবে ছত্রিশ থেকে আটচল্লিশ ঘণ্টা, মানে মেরে-কেটে দেড় থেকে দু'দিন। আগের বার খুব ছোট করে করেছিলাম বলে কম টাইম নিয়েছিলুম, এবার খানিকটা বড় করে করছি, প্রসেস সামান্য পালটে দিয়েছি।... যাই হোক, এই আটচল্লিশ ঘণ্টা খুব সাবধানে থাকতে হবে। কোনো রকম অবস্ট্রাকশান চলবে না, বাইরের কেউ ভেতরে ঢুকতে পারবে না, বুঝলে?”

বাইরের কেউ বলতে মামা কাকে বোঝাচ্ছেন বুঝতে পারলাম না। বাইরের কেউ এ-বাড়িতে তো ঢোকে না। মিস্ত্রী-মজুররা একসময়ে ঢুকত, তাদের কাজ শেষ হবার পর আর আসে না। আসার মধ্যে কিষণ বলে একটা বুড়ো আসে রোজ গোবরের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে, তার কাজ হল যেখানে যত গোবর পাবে নিয়ে এসে গ্যাস গবেষণার বাড়িতে জমা করবে। তা হলে?

টুলু বলল, “মামা, আমরা আসব না?”

মামা বললেন, “তোমরা? হ্যাঁ, তোমরা আসবে। তোমাদের আসতে হবে বলে আমি ডিউটি চার্ট করেছি।” বলে মামা ফাইল হাতড়ে একটা আলগা কাগজ বের করলেন।

ডিউটি চার্ট আমরা বুঝতাম। স্কাউট হবার দরুন নানা ধরনের ছোট বড় ডিউটি আমরা এ-শহরে দিয়েছি।

কাগজটা দেখে দেখে মামা বললেন, “কাল সকাল থেকে

তোমাদের ডিউটি পড়ছে। কাল রবিবার। তাই না?”

আমরা মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

“রবিবার দেখেই আমি দিন ঠিক করেছি,” মামা বললেন, “কাল সকাল সাতটায় কানু আর টুলু চলে আসবে। বারোটায় তোমরা খেতে যাবে, তার আগে আসবে অন্তু আর ব্রজ। অন্তু আর ব্রজ থাকবে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত। নেক্সট ডিউটি বিজন আর মানস…।” মামা চার-পাঁচ ঘণ্টা করে আমাদের সকলের ডিউটি ভাগ করে দিলেন। রাত ন'টার পর কাগজে-কলমে আমাদের কারও ডিউটি নেই। রাত্রিতে মামা নিজে থাকবেন, আর থাকবে বীর বাহাদুর, টাইগার তো আছেই। আমার, বাসুর আর হারুর ডিউটিটা হল বেখাপ্পা রকমের। হারুর ডিউটি পড়ল সাইকেলে করে বাড়ির চারপাশে ওয়াচ রাখার, বাসুকে মামা গোবরের সাপ্লাই ও স্টক দেখার চার্জ দিলেন, আর আমায় দিলেন গ্যাস প্রেসার দেখার কাজ। সেটা কী বস্তু বুঝলাম না। মামা বললেন, বুঝিয়ে দেবেন।

বিজন বলল, “মামা, কাল আমাদের সকলের ছুটি—আমরা সারা দিনরাতই থাকতে পারি।”

পরের দিন সাত-সকালে আমরা গ্যাস গবেষণা ভবনে গিয়ে হাজির। সকালের ডিউটি যারই হোক, আমাদের যেতে কোনো বাধা ছিল না; যার যার নিজের ডিউটিতে কামাই না করলেই হল। মামা সে ব্যাপারে কড়া হুকুম দিয়ে দিয়েছিলেন। অবশ্য হুকুমের কথাই ওঠে না, আমরা তো নিজের গরজেই চব্বিশ ঘণ্টা হাজির থাকতে রাজী।

আমার পৌঁছতে দু-পাঁচ মিনিট দেরী হয়ে গিয়েছিল। গিয়ে দেখি, অন্তু-হারু-কানু-নন্তু-বিজন সব হাজির। ব্রজ কাঠচাঁপা গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে আছে, বাইরেটাও নজর রাখছে।

ব্রজর টাইগার গাছতলায়, বীর বাহাদুর সদর আগলে দাঁড়িয়ে। টিনের চালার তলায় সেই যে পাশাপাশি দুটো যজ্ঞের চৌকোনো উনুন পাতা হয়েছিল—জোড়া উনুন—তার পেছনের দিকে একটা বাঁকা চোঙা। সেখান থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে, কালো ধোঁয়া। উনুন ধরানো হয়ে গিয়েছিল। উনুনের আর-এক পাশ থেকে একটা মোটা নল এসেছে বারান্দায়, বারান্দার একপাশে একটা বড় ড্রাম, ড্রামের মাথাটা ঢাকা, গায়ের পাশ দিয়ে একটা নল বেরিয়ে এসেছে। উনুন আর ড্রাম দু'দিকের দুটো নল পাশাপাশি মামার যন্ত্রঘরে চলে গেছে। বারান্দার ড্রামটায় যে গোবর পচানো হয়েছে বোঝাই যাচ্ছিল—গন্ধ উঠছিল খুব, মাছি জুটে গিয়েছে।

যন্ত্রঘরে মামা কাজকর্ম তদারকি করছিলেন। আমরা সকলেই প্রায় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। ঘরের ভেতরে পা দেবার মতন জায়গা ছিল না। ব্যস রে ব্যস—কত রকম জিনিসই যোগাড় করেছেন মামা! একটা ঘরে এত জিনিস জমা করা যায় আমরা জানতাম না। মেঝে থেকে মাথা পর্যন্ত নানা ছাঁদের যন্ত্র। কেরাসিনের টিন, মাটির জালা, রবারের নলটল তো আছেই—তা বাদেও কত কি আছে: বিরাট কচ্ছপের মতন একটা পা-অলা মুখবন্ধ ড্রাম, হাপরের মতন যন্ত্র, কুমিরের বাচ্চার মতন রবারের একটা মস্ত ব্লাডার, সাইকেলের প্যাডেল আর চেন, তারের জালির মধ্যে ইংরেজী 'জেড্' অক্ষরের মতন অজস্র নল, ওজন যন্ত্রের মতন দেখতে কাঁটাঅলা যন্ত্র, এলার্ম ঘড়ির মতন ঘড়ি এক জোড়া, আরও কত কি। মামা একটা সিঁড়িঅলা টুলের ওপরে বসে কাজ করছিলেন, গায়ে আলখাল্লা, পকেটে প্লাস, রেঞ্জ, হাতে রবারের দস্তানা, পায়ে মোটা মোটা কেড্‌স জুতো। মামার চোখের চশমা ঝুলে পড়েছে।

টুলের ওপর থেকে নেমে এলেন মামা। মুখ বেশ হাসিখুশী।

"কি রে, কেমন দেখছিস?" মামা জিজ্ঞেস করলেন।

আমরা আর কি দেখব! চোখ বড় বড় করে দাঁড়িয়ে এই আশ্চর্য কলকব্জা দেখছিলাম। মাথায় কিছুই ঢুকছিল না। সহজ

একটা জ্যামিতি মাথায় ঢুকোতে যাদের ঘিলু শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়—তারা এসব কি বুঝবে!

মামা আমাকে ইশারায় ডাকলেন। ডেকে সেই ওজন যন্ত্র আর ঘড়ির মতন জিনিসটা দেখিয়ে দিলেন। বললেন, "দেখে রাখ, ও দুটো গ্যাস প্রেসার মাপার যন্ত্র। গ্যাস কতটা জমছে বুঝতে পারবি।"

মামা ঘরের বাইরে এলেন।

কানু ফিসফিস করে বলল, "ঘরে একটা চৌবাচ্চা থাকলে ভাল হত।"

"কেন?" বিজন জিজ্ঞেস করল।

"গ্যাস বেশি হয়ে গেলে আগুন লেগে যেতে পারে।"

কথাটা অন্তু শুনতে পেয়েছিল, ধমক দিয়ে বলল, "বাজে বকিস না, যত অলুক্ষণে কথা।"

বারান্দার চারদিকে তাকিয়ে মামা এবার তাঁর অফিস-ঘরে ঢুকলেন। উঠোনে টাইগারটা ভয়ংকর চেঁচাচ্ছিল, ছোটাছুটি করছিল। ব্রজ কাঠচাঁপা গাছ থেকে নেমে এসেছে। জ্বলজ্বলে রোদ বাইরের উঠোনে।

মামা অফিস-ঘরে ঢুকলেন। আমরাও তাঁর পিছু পিছু ঢুকে পড়লাম। ছোট টেবিলের ওপর চার্ট কাগজ, বাঁধানো খাতা পড়েছিল। মামা লাল-নীল পেন্সিল তুলে নিয়ে চার্ট কাগজে বড় বড় ফোঁটা দিলেন কয়েকটা, খাতায় কি লিখলেন, তারপর নিজের ইজিচেয়ারে আরাম করে বসলেন, মামার যে খুবই খাটুনি যাচ্ছে আমরা বুঝতে পারছিলাম। মাথার খাটুনি তো আছেই, তার ওপর এইসব যন্ত্রপাতি তৈরীর খাটুনি। কামারশালার হরিমিস্ত্রীকে আনিয়ে মামা কম কাজ করিয়েছেন! এই বয়েসে এত পরিশ্রম করা সহজ নয়।

ঘরে বসবার জায়গা কম বলে আমরা গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম। একটু গরম গরম লাগছিল। লাগারই কথা। ঘরে

এত জিনিসপত্র, পাশের ঘরে গ্যাস হচ্ছে, বাইরে জোড়া উনুন জ্বলছে দাউ দাউ করে, শীতও আর সকালের দিকে অতটা নেই, খানিকটা গরম তো লাগবেই।

চেয়ারে বসে মামা এবার আরাম করে একটা নতুন চুরুট ধরিয়ে চোখ বুঁজে বসে থাকলেন।

অন্তু আমার কানে কানে বলল, "মামা রাত্তিরে মাত্তর এক ঘণ্টা ঘুমোন।"

আমি কিছু বলার আগেই চোখ খুলে মামা বললেন, "কাল সন্ধ্যে নাগাদ বোধ হয় বাতি জ্বালাতে পারব।"

কাল সন্ধ্যে পর্যন্ত আমাদের ধৈর্য ধারণ সোজা কথা নয়, কিন্তু উপায় তো নেই।

বাইরে অনেকগুলো কাক ডাকতে শুরু করেছিল। দিনের বেলায় কাক ডাকবে এ আর নতুন কথা কি, কিন্তু একগাদা কাক একসঙ্গে কা কা করলে বড় কানে লাগে। কে জানে, কাকগুলোও আমাদের গ্যাস তৈরীর খবর পেয়ে গেল কি না! টাইগারটাও বেজায় চেঁচাচ্ছিল।

হঠাৎ মামা বললেন, "কাল যে বাতিটা প্রথমে জ্বালাব, তোদের এখন সেটা দেখাই।" বলে মামা অন্তুকে ডাকলেন।

অন্তু কাছে যাবার আগেই বললেন, "ওই যে ওটা—নিয়ে আয়।"

ঘরের কোণ থেকে অন্তু একটা কাপড়ে ঢাকা জিনিস নিয়ে এসে মামার পাশে রাখল। অন্তু যেটা আনল সেটা আমরা আগে দেখিনি, মামা দেখাননি। দেখে মনে হল, এ যেন কোনো ম্যাজিকের জিনিস, কালচে কাপড় দিয়ে ঢাকা। মামা কাপড়টা সরিয়ে নিলেন। আমাদের চোখের পাতা আর পড়ে না।

লণ্ঠন, টেবিল বাতি, ডিজ্ ল্যাম্প, মোমদান, পেট্রম্যাক্স, ডে লাইট, কার্বাইডের বাতি আমরা দেখেছি, কিন্তু এমন বাতি আর দেখিনি। এ এক অদ্ভুত বাতি। কার্বাইডের বাতির মতন নীচের

দিকে একটা খোল; বেশ পেট-মোটা খোল, তার মাঝখান দিয়ে সরু নল উঠে গেছে, হাত তিনেক লম্বা, নলের মুখের ওপর গোল করে তারের জালতি, খাঁচার মতন দেখাচ্ছিল, জালের গায়ে অভ্রের পাত, পেট্রম্যাক্স বাতির ম্যাণ্টেলের মতন একটা ম্যাণ্টেল ঝুলছিল ওপর থেকে। বাতির ওপরের দিকটা তেমন কিছু জটিল নয়, কিন্তু নীচের খোলের দিকটায় বেশ কয়েকটা টুকিটাকি রয়েছে। পেট্রম্যাক্স বাতির গায়ে যেমন থাকে সেই রকম, তার চেয়েও বাড়তি কিছু।

মামা বললেন, "এই বাতিটা একটু আলাদাভাবে তৈরী। তোদের রাস্তায় বাতি এরকম হবে না। সেটা হবে সিম্প্ল। এটা আমায় অন্যভাবে করতে হয়েছে। গ্যাসটা নীচে এসে জমবে, ওই নল দিয়ে। যদি গ্যাসটা ভারী হয়ে যায়, ওপরে উঠতে চাইবে না, তখন একটু পাম্প করে দিতে হবে। সমানভাবে গ্যাস না গেলে বাতি কখনও নিবে আসবে, কখনও জোরে জ্বলবে। সেটা কন্ট্রোল করার জন্যে ওই চাবিটা, ওটা বাঁয়ে ডানে ঘুরিয়ে গ্যাস কনট্রোল করা যাবে। আর ওই যে কাঁটা দেখছিস—ওটা গ্যাসের প্রেসার মাপার।"

মামা আরও যেন কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন, এমন সময় বাইরে বীর বাহাদুরের চেঁচামেচি আর টাইগারের বিকট চিৎকার শুনে আমরা কেমন থতমত খেয়ে গেলাম। বিজন আর ব্রজ-- আমাদের রবার্ট ব্লেক আর স্মিথ লাফ মেরে বারান্দা দিয়ে ছুটল। আমরাও পেছন পেছন ছুটলাম।

বাইরে এসে দেখি, বিচ্ছিরি এক কাণ্ড হয়েছে। পাড়ার যত কাক আমাদের গ্যাস ভবনে এসে জুটেছে। টিনের চালার ওপর কাক, কাঠচাঁপা গাছের ডালে ডালে কাক, উঠোনে কাক। কাকে কাকে ভরে গেছে, আর অত কাক একসঙ্গে কা কা করে সমানে চেঁচাচ্ছে। সেই ডাক শুনে শহরের যত কাক সব যেন ছুটে আসছে।

ব্যাপারটা বোঝবার আগেই বীর বাহাদুর একটা মরা কাক দেখাল। টিনের চালার তলায় উনুনের কাছাকাছি পড়ে আছে। কাকটা কেউ ফেলে গেছে, না কি টাইগার তাকে মেরেছে, কিছুই বোঝা গেল না। দেখতে দেখতে সব কালো হয়ে যাচ্ছিল। টিনের চালা কালো, পাঁচিল কালো, কাঠচাঁপা গাছও কালো। উঠোনেও অজস্র কাক লাফাচ্ছে।

ব্রজ আর বিজন লাঠি নিয়ে কাক তাড়া করতে উঠোনে নেমেছিল। পালিয়ে এল। আমরাও আর উঠোনে নামলুম না। কাকের ঠোক্কর বড় সাংঘাতিক। বীর বাহাদুরও পালিয়ে এসেছে। শুধু টাইগার একলা আরও কিছুক্ষণ লড়ে খোলা সদর দিয়ে পালাল।

মামা বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, "বুঝতে পেরেছি। এটাও আমাদের শত্রুর কাজ।"

৮

কথায় বলে, একটা কাক মরলে কাকের সভা বসে যায়। কিন্তু সেটা যে কী জিনিস, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আমাদের বেলায় যা হয়েছিল তা যেন আরও বেশী। বোধ হয় গোটা শহরের কাক এসে জড় হয়েছিল গ্যাস গবেষণা ভবনে। আর কী তাদের কা কা চেঁচানি! সারা উঠোনময় কাক; গাছে, পাঁচিলে, বাড়ির মাথায়। কাকে কাকে কালো হয়ে গিয়েছিল বাড়িটা। আমরা বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম, অত কাক দেখে দেখে ঘেন্নায় গা গুলিয়ে উঠছিল। দুপুর পর্যন্ত কেউ আর উঠোনে নামতে পারলাম না। মল্লিকদের বাগান থেকে মালী এসেছিল ছুটে, আরও পাঁচ-সাতজন পাড়ার লোক ব্যাপারটা দেখতে এসে সদর থেকেই পালিয়ে গেল। শেষে নাথু জমাদার তার ছোট ভাইকে সঙ্গে করে এনে মরা কাক সরিয়ে আমাদের বাঁচাল। বিকেলের দিকে আর একটাও কাক থাকল না।

সারা দিনের এই ধকল আমাদের বেশ কাবু করে ফেলেছিল। বাড়ি ফিরে অবেলায় স্নান-খাওয়া সেরে হাই তুলতে তুলতে আবার আমরা গ্যাস গবেষণা ভবনে এলাম। মামা আর বাড়ি যাননি; তাঁর জন্যে বাড়ি থেকে খাবার এসেছিল—খাননি, শুধু দু' পেয়ালা চা খেয়েছেন। মামাকে এত মনমরা, ক্লান্ত, গম্ভীর দেখাচ্ছিল যে আমাদের খুব দুঃখ হচ্ছিল। ঘটনাটা কেমন করে ঘটেছে আমরা জানি না। কেউ বলল, জগা পাগলা রাস্তার মরা কাক পাঁচিল টপকে ছুঁড়ে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছে; এটা নাকি তার প্রতিশোধ। মামা একদিন জগা পাগলাকে বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে

ধমক-ধামক দিয়েছিলেন ; জগা তার শোধ নিয়েছে। কেউ বলল, অত বড় বড় উনুন জ্বলছে, মস্ত মস্ত ড্রাম রয়েছে এদিকে সেদিকে, দু-চারটে কাক বোধ হয় ভেবেছিল, জোর কোনো ভোজ হচ্ছে, সেই লোভে তারা ব্যাপারটা দেখতে এসেছিল, উঠোনে বসেছিল। আমাদের টাইগার তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একটাকে মেরে ফেলে। কাক মারা সোজা কথা নয়, সহজও নয়, তবু আমাদের কপাল মন্দ, টাইগার শক্ত কাজটাই ঘটনাচক্রে করে ফেলেছিল। অবশ্য টাইগার যে কাক মেরেছে এটা কেউ দেখেনি—বীর বাহাদুরও চোখে দেখেনি। তবে সে টাইগারের ঘাড়েই দোষটা চাপিয়ে দিল। মামা অবশ্য বার বার বলতে লাগলেন যে, এটা এনিমি ক্যাম্পের কাজ, শত্রুতা করা হয়েছে।

শত্রুতার গন্ধ আছে বলেই হোক, কিংবা এতদূর এসে হটে যাওয়া কাপুরুষতা বলেই হোক—আমরা ঠিক করলাম, গ্যাস গবেষণা ভবনের চারপাশে আমরা দুর্গের মতন পাহারা দেবো। একটা সন্ধ্যে আর রাত পাহারা দেওয়া এমন কি কঠিন কাজ ?

বিজন স্পষ্টই বলে দিল, সে আর বাড়িই যাবে না আজ।

কানু বলল, সে সন্ধ্যের মধ্যে বাড়ি গিয়ে খাওয়াদাওয়া সেরে চলে আসবে।

ব্রজ কয়েকটা লাঠি, লণ্ঠন আর টর্চের যোগাড় করতে বেরিয়ে গেল।

মামা তাঁর চেয়ারে বসেই থাকলেন বেশীর ভাগ সময়। মাঝে মাঝে যন্ত্রঘরে আসছিলেন। ফিরে গিয়ে চার্ট পেপারে নীল পেন্সিলের দাগ মারছিলেন।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। যে যার বাড়িতে গিয়ে জানিয়ে এল, আজ আর রাত্রে বাড়ি ফিরবে না। বাড়ির লোক কি সহজে ছাড়ে! অন্তু আর ওআণ্ডার মামার কথা বলে তবে ছাড়ান।

শীত কমে গিয়েছিল, তবু একেবারে চলে যায়নি। সন্ধ্যের

দিকে তেমন কিছু না করলেও সামান্য রাত থেকে শীত শীত করত। মাঝ রাতে তো শীত পড়বেই। আমরা গরম জামা-টামা, জুতো-মোজা পরে, মাফলার-টাফলার নিয়ে তৈরী হয়েই এসেছিলাম। ব্রজ এনেছিল কম্বল—এক জোড়া ভুট কম্বল, আর হনুমান টুপি। কানু একটা করকরে রেলের ওভারকোট যোগাড় করে এনেছিল। বিজন রাত জাগার জন্যে চা, চিনি, দুধ-টুধ নিয়ে এসেছিল। সেই সঙ্গে স্পিরিটের শিশি, স্টোভ। গত বছরে আমরা স্কাউট হয়ে রাঁচির কাছে একটা জায়গায় গিয়েছিলাম, মিশনারি একটা স্কুলে ছিলাম, তখন ভয়ংকর শীত, সেখানে আমাদের ক্যাম্প ফায়ার হয়েছিল। গ্যাস গবেষণা ভবনে আমরা যেভাবে জাঁকিয়ে বসলাম—তাতে আর একবার ক্যাম্প ফায়ার হচ্ছে বলে মনে হচ্ছিল।

মামা রাত্রে খানিকটা দুধ খেলেন, আর এক প্লেট হালুয়া। তারপর তাঁর ইজিচেয়ারে শুয়ে চোখ বুঁজে চুরুট খেতে লাগলেন।

আমরা বারান্দায় বসলাম। লণ্ঠন জ্বালিয়ে। ব্রজ লাঠি-টাঠি একপাশে জড় করে রাখল। আস্তে আস্তে রাত হতে লাগল। নটার সময় কোতয়ালীতে ঘণ্টা পড়ে। সেই ঘণ্টাও পড়ে গেল। চারদিক খুব অন্ধকার। অমাবস্যা-টমাবস্যা হতে পারে আজ। টাইগার সেই যে পালিয়েছে আর আসেনি। বীর বাহাদুরকে রাত্রের মতন ছুটি দিয়ে দিয়েছি আমরা, অন্যদিন সে এই বাড়িতে থাকে, আজ তার থাকার জায়গা নেই, দরকারও নেই।

নন্তু বলেছিল ক্যারাম বোর্ডটা আনতে, আমরা আনিনি। ক্যারাম খেলার মতন মনের অবস্থা তখন নয়। মামাই বা কি ভাববেন!

গোল হয়ে বসে আমরা গল্প করছিলাম। সকালের ব্যাপারটা তখনও কারও মাথায় আসছিল না। সত্যিই কি কেউ শত্রুতা করছে আমাদের সঙ্গে? গেনুদা তো বিছানায়। মণ্টুদা গিয়েছে কোন বিয়েতে। কে করবে শত্রুতা?

নন্তু বলল, "শত্রুতা করে লাভটাই বা কি হল? আমাদের

গ্যাস তৈরী বন্ধ হল ?”

কানু বলল, “রাতটা আগে কাটুক! দিনের বেলায় যদি মরা কাক ছুঁড়ে ফেলতে পেরে থাকে তো রাত্তিরে কি করবে কে জানে!”

বিজন বলল, “কচু করবে। দশটার পর থেকে আমরা থানা চৌকির মতন পাহারা দেবো।”

ব্রজ তার কোলে টর্চ নিয়ে বসেছিল। মাঝে মাঝেই টর্চ জ্বেলে চারপাশ ভাল করে দেখে নিচ্ছিল।

শীত বাড়তে লাগল। সেই সঙ্গে মশা। মশা আমাদের ছেঁকে ফেলছিল। আর পচা গোবরের গন্ধ এমনভাবে ছড়িয়ে যাচ্ছিল যে, আমরা নাক-মুখ কুঁচকে মাঝে মাঝে ওয়াক তুলছিলাম। মাথাও বেশ ধরে গিয়েছিল। কানু আমাদের চাঙ্গা করবার জন্যে রগড় করে বলছিল, ‘দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে।’

দশটাও বেজে গেল। দশটার পর থানা চৌকির মতন পাহারা। নন্তু আর হারুকে লাঠি আর টর্চ দিয়ে বিজন গ্যাস ভবনের চারপাশে ঘুরে আসতে বলল। প্রথমে কথা হয়েছিল—সদরের দু'দিকে দু'জনে দাঁড়িয়ে থাকবে দু'ঘণ্টা। কিন্তু তাতে কেউ রাজী হল না। ঠাণ্ডার মধ্যে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে থাকলে নির্ঘাত নিউমোনিয়া। তখন ঠিক হল, আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর একবার করে বাইরেটা ঘুরে এলেই চলবে। সেই হিসেবে নন্তু আর হারু বাইরে চক্কর মারতে গেল।

অন্তু মামাকে একবার গলা বাড়িয়ে দেখে নিল। ইজিচেয়ারে চোখ বন্ধ করে মামা শুয়ে আছেন, হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছেন। এত পরিশ্রম আর চিন্তা কি তাঁর বয়সে সহ্য হয়!

আমরা গোল হয়ে বসে গল্প করতে করতে হাই তুলতে লাগলাম। গোবরের গন্ধ যেন আরও বিচ্ছিরি হয়ে নাকে লাগছিল। কেন লাগছিল জানি না, সারা দিন ধরে পচা গোবর আরও পচছে বলেই, না কি পচা গোবরের মধ্যে মামা কোনো ওষুধ-বিষুধ

ঢেলে দিয়েছেন বলেই, বোঝা গেল না। এমনও হতে পারে—রাত্রের দিকে বাতাস দিচ্ছিল বলেই আরও গন্ধ উঠছিল। নাক খুলে রাখাই মুশকিল বলে আমরা নাক চাপা দিচ্ছিলাম। যন্ত্রঘরের একদিকে কার্বাইডের একটা বাতি জ্বলছে, তার গন্ধও আসছিল। তা ছাড়া, আমাদের মনে হল, কার্বাইড কোনো কাজে লাগবে বলে মামা যেন কোথাও কিছু কার্বাইড ভিজিয়েছেন। তারও গন্ধ আছে।

বিজন এবার চা করতে বসল। এত ঘুম পাচ্ছিল যে, চা না হলে বসে থাকাই দায়। বারান্দার এক কোণে স্টোভ জ্বালিয়ে অনেক কষ্টে চা হল। বাতাসে স্টোভ নিবে যাচ্ছিল।

বারোটাও বেজে গেল। একেবারে চুপচাপ সব। ভীষণ অন্ধকার বাইরে। শীত বেড়ে উঠে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল আমাদের। অন্তু আর কানু চা খেয়ে ভুট কম্বল মুড়ি দিয়ে টর্চ হাতে চক্কর মেরে এল বাইরে থেকে।

আমরা আরও কুঁকড়ে জড়সড় হয়ে বসে। মশা কামড়াচ্ছে অনবরত। এ-ওর গায়ে ঢলে পড়ছিলাম ঘুমে। ব্রজ তখনও পিঠ টান করে বসে। বিজন লম্বা লম্বা হাই তুলছিল। কানু ঘুম তাড়াবার জন্যে একটা গল্প শুরু করল। খানিকটা বলে আর তার গলার স্বর উঠল না। হারু একপাশে হেলে ঘুমিয়ে পড়েছিল, অন্তুরও সেই অবস্থা। নন্তু বমি তোলার মতন করল একবার, তারপর বলল, "গন্ধর জন্যে মরে যাব।"

একটা কি দুটো বেজে গেল। শীত একেবারে হাড়ে গিয়ে লাগছিল। বিজন আমাকে চক্কর মারতে পাঠাল, সঙ্গে ব্রজ। কম্বল মুড়ি দিয়ে টর্চ আর লাঠি হাতে আমরা বাড়ির চারপাশে চক্কর মারতে বেরুলাম। শীতে হাত-পা কনকন করছিল, ঘুটঘুটে অন্ধকার, রাস্তার পাশে জামগাছটা যেন একটা বিরাট দৈত্যের মতন দাঁড়িয়ে।

ব্রজ হঠাৎ বলল, "এই গাছটায় গণেশজী থাকে।"

গণেশজীর নামটা ব্রজ এমন সময় মনে করিয়ে দিল যে বুকের মধ্যে ধ্বক্ করে উঠল। আমাদের বয়স তখন অনেক কম, গণেশ মিশির বলে এক রেলের গার্ড থাকতেন। পায়ের দোষ ছিল। লোকে বলত, ল্যাঙড়া গণেশ। একবার গণেশজী রাত্রে মালগাড়ি নিয়ে ফেরার সময় কেমন যেন ভুল করে চলতি মালগাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়েন। ভেবেছিলেন, স্টেশন এসে গেছে। কাটা না পড়লেও হাত-পা ভেঙে, মাথা ফেটে গণেশজী রেল লাইনের পাশে সারা রাত পড়েছিলেন। সকালে তাকে খুঁজে পেয়ে এই রাস্তা দিয়ে যখন খাটিয়া করে বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন গণেশজী মারা যান। রেলের ছোট হাসপাতালে পৌঁছবার আগেই মারা গিয়েছিলেন গণেশজী। লোকে বলে, গণেশজীর অপঘাতে মৃত্যু হয়েছিল, এই জামগাছতলাতেই তাঁর প্রাণটা বেরিয়ে যায়। সেই থেকে গণেশজী জামগাছটার ডালপালার মধ্যে কোথাও সূক্ষ্ম আত্মা নিয়ে থেকে গেছেন। জামগাছ তলায় গনেশজীকে রাতে-বিরাতে নাকি দেখাও যেত ছায়ার মতন। এসব আমরা শুনেছি আগে, বিশ্বাসও করতাম। আজকাল আর গণেশজীর কথা শোনা যায় না।

ব্রজ গণেশজীর কথাটা তুলে আমায় ভয় পাইয়ে দিল। গা ছমছম করতে লাগল। একেবারে থমথমে রাত, চারদিক নিঃসাড়, কোথাও এক ফোঁটা আলো জ্বলছে না—জামগাছটা দৈত্যের মতন দাঁড়িয়ে; মনে হল, গণেশজী যেন আড়ালে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের দেখছেন।

মল্লিকদের বাগানের দিক থেকে কনকনে বাতাসও ভেসে এল। গাছপাতার শব্দ হল সরসর করে।

ব্রজ আর আমি তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলাম।

বিজন লণ্ঠন সামনে নিয়ে ঢুলছিল।

ব্রজ বলল, "বাইরে যাবার দরকার নেই, বারান্দায় বসে নজর রাখলেই চলবে।"

নন্তুটন্তু কোল বালিশের মতন এ-ওর গায়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিল। বিজনও ঘুমে টলে.টলে পড়ছিল। আমরাও আর পারছিলাম না।

কখন যে সবাই মিলে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না, হঠাৎ চেঁচামেচি শুনে ঘুম ভাঙতেই দেখি ফরসা হয়ে গেছে। কিন্তু ফরসা হয়ে গেলে কি হবে, মামার যন্ত্রঘরে কি যেন একটা হয়েছে, ধোঁয়া বেরুচ্ছে, গন্ধ আসছে বিচ্ছিরি। আর মামা প্রাণপণে চেঁচাচ্ছেন। আমরা সকলেই হকচকিয়ে গিয়েছিলাম। কিছু বোঝার আগে তাড়াতাড়ি উঠতে গিয়ে কে কার ঘাড়ে পড়লাম, কার গলা টিপে দিলাম, কার পেটে লাথি মারলাম, কিছুই জানি না। একবার মনে হল, মামার গ্যাস হয়ে গিয়েছে, হয়ত তাই অত ধোঁয়া আর গন্ধ, কিন্তু মামা ওভাবে চেঁচাচ্ছেন কেন? আনন্দে নাকি?

যন্ত্রঘরের মধ্যে তাকানো যাচ্ছিল না; ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কালো হয়ে আছে। উনুনে কাঁচা কয়লা ঢাললে যেমন চাপ চাপ ধোঁয়া উঠতে থাকে—দরজার মধ্যে দিয়ে সেই রকম ধোঁয়া আসছিল দমকে দমকে। আমাদের সাধ্য কি ঘরের মধ্যে ঢুকি। ধোঁয়ার চোটে চোখে জল আসছিল, কাশতে শুরু করলাম সবাই। মামা ঘরের মধ্যে কি করছেন দেখতেই পাচ্ছিলাম না। ধোঁয়ার সঙ্গে রবার পোড়ার বিকট গন্ধ, চামড়া পোড়ার গন্ধ ভেসে আসছিল। ওই অবস্থায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। হারু না নন্তু কে যেন লাফ মেরে উঠোনে পড়ল। কানু চেঁচিয়ে বলল, "আগুন ধরে গেছে। পালা।"

আমরা একবার শুধু ঝাপসা ভাবে দেখতে পেলাম, মামা ঘরের মধ্যে অন্ধের মতন শুধু হাতড়ে বেড়াচ্ছেন, টলছেন। কেশে কেশে মরে যাচ্ছিলেন।

মামাকে আমরা বাইরে বেরিয়ে আসার জন্যে প্রাণপণে ডাকছিলাম।

এমন সময় ঘরের মধ্যে কি যেন ফাটতে শুরু করল। হুড়মুড় করে উঠোনে নেমে পড়লাম সবাই। মামা তখনও ঘরে।

কানু জল জল বলে চেঁচাতে লাগল। বিজন চেঁচাতে লাগল, আগুন আগুন বলে। আমরা মামাকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলাম।

শেষ পর্যন্ত মামা টলতে টলতে বাইরে বেরিয়ে এলেন। দম টানছেন হাপরের মতন। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। চশমাটা চোখে নেই, চোখের পাতাও খুলতে পারছেন না।

আমরা ছুটে গিয়ে মামাকে উঠোনে নামিয়ে আনলাম। মামা দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেন না, উঠোনে শুয়ে পড়লেন আকাশ-মুখো হয়ে।

ততক্ষণে যন্ত্রঘরে আগুন লেগে গেছে। খোলার চালের ঘর, মাথায় কাঠের কাঠামো, দেওয়ালে আলকাতরা।

খবরটা কেমন করে ছড়িয়ে পড়েছিল জানি না। ওই সকালে দেখতে দেখতে পাড়ার লোকজন ছুটে এল আগুন নেবাতে।

আগুন যখন নিবলো, তখন যন্ত্রঘরের অবস্থাটা দেখে কানু বলল, "একেবারে নিকুম্ভিলা হয়ে গেছে।"

সারাটা দিন কেমন করে যে কাটল বলা যায় না। পরীক্ষায় ফেল করা ছেলেদেরও এত মন খারাপ হয় না। কি করে যে আগুন ধরল তাও বোঝা গেল না। কানু বলল, গ্যাস বেশী হয়ে গিয়েছিল। বিজন বলল, কোলিয়ারীতে যেভাবে আগুন লেগে যায় সেই রকম কিছু হয়েছিল। হারু বলল, কেউ আগুন দিয়ে পালিয়ে যেতেও পারে। আমরা অনেক রকম ভাবলাম, নানা সন্দেহ করলাম, কিন্তু কেমন করে যে আগুন লেগেছিল তা বুঝতে পারলাম না। মামার কাছে যাবার মুখও আর আমাদের নেই। তা ছাড়া, সেই যে মামা উঠোনে এসে চোখ বুঁজে শুয়ে পড়েছিলেন

তারপর আর একটাও কথা বলেননি। অন্তুর বাবা—নৃপেন জ্যাঠামশাই—খবর পেয়ে ছুটতে ছুটতে এসে মামাকে ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন। বাড়ি গিয়ে মামা বিছানা নিয়েছেন শুনেছি।

দুপুর গেল, বিকেল গেল—আমরা আবার প্রায় সবাই কানুদের বাড়িতে জমা হলুম। ব্রজ ছিল না। চোখমুখের যা চেহারা হয়েছে আমাদের তা আর বলার নয়। চুপসোনো মুখে সবাই বসে আছি আর হায় হায় করছি।

এমন সময় অন্তু এল। গম্ভীর মুখ।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "মামা কেমন আছেন?"

"ব্রেনে ধোঁয়া ঢুকে গেছে।"

ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। নাকে-মুখে ধোঁয়া ঢুকে যায় জানি, বেরিয়েও যায়, ব্রেনে কি করে ঢোকে, আর ঢুকলেও সেটা কী ক্ষতি করে জানি না। অন্তুর মুখ দেখে মনে হল, ব্রেনে ধোঁয়া ঢোকা একটা সাংঘাতিক ব্যাপার।

কানু বলল, "মামা কথা বলছেন না?"

"না। পারছে না।"

আমরা চমকে উঠলাম। মামা কথা বলতে পারছেন না। সর্বনাশ!

"সে কি রে? তবে? একবারে চুপচাপ শুয়ে আছেন?" বিজন জিজ্ঞেস করল।

অন্তু আস্তে করে ঘাড় নাড়ল। তারপর বলল, "এখানকার ঘোষ ডাক্তারকে বাবা ডেকে পাঠিয়েছিল। মামা ডাক্তারকে ঘরে ঢুকতে দেয়নি।"

"কেন?"

"মামা একটা কাগজে লিখে দিয়েছে, ব্রেনে ধোঁয়া ঢোকার ব্যাপার এখানকার ডাক্তাররা কিছুছু বুঝবে না। মামা নিজে বুঝতে পারছে—কম করেও এক শিশি ধোঁয়া ব্রেনের মধ্যে চলে

গেছে। রোগটা খুব খারাপ। তাড়াতাড়ি বের করতে না পারলে সমস্ত ব্রেন নষ্ট হয়ে যাবে।"

আমরা প্রায় আঁতকে উঠলাম। হায় হায়, এ কি হল? কোথাকার একটা পুচকে শহরে গ্যাসের আলো জ্বালাতে গিয়ে মামার এই অবস্থা হল? তাও আমাদের মতন ক'টা 'নেফুর' জন্যে। মামার ব্রেন নষ্ট হয়ে যাওয়ার মানে বিরাট ক্ষতি। কত ক্ষতি যে সারা জগতের আমরা করলাম! আমাদের চোখ ছলছল করতে লাগল।

আমি কান্না-কান্না গলায় জিজ্ঞেস করলাম, "তা হলে কি হবে?

অন্তু বলল, "মামা কালই কলকাতায় চলে যাবে। সেখানে মামার কোন চেনা-জানা ডাক্তার আছে, বড় ডাক্তার। তাকে দিয়ে একবার দেখিয়ে সোজা জাপানে যাবে।"

"জাপান?"

"জাপানে এর চিকিৎসা আছে। ওরা পারে। মুশকিল হল, রোগটা এমন ডেন্‌জারাস যে দেরী করাও যাবে না, দেরী করলেই গণ্ডগোল। সমস্ত ব্রেন নষ্ট হয়ে যাবে।"

আমরা কেউই চাই না মামার ব্রেন নষ্ট হোক। খুব তাড়াতাড়িই মামার জাপান যাবার দরকার। নন্তু বলল, "যাবেন কি করে?"

"ছোট মামাকে কলকাতা থেকে বিলেতে খবর পাঠাতে হবে। ছোট মামা যদি আসতে পারে, এরোপ্লেনে করে বড় মামাকে জাপানে নিয়ে যাবে। না হলে জাহাজে যেতে হবে। জাহাজ বড় দেরী করে। আমাদের সেইটেই ভয়। মা যা কাঁদছে সারাদিন!"

মামার জন্যে আমাদেরও বুক টনটন করছিল। কেন মামা গ্যাসের বাতি জ্বালাবার জেদ ধরলেন! না হয় না জ্বলত বাতি। আমরা তো মরে যাচ্ছিলুম না। এই শহরে লণ্ঠন, কুপি, কার্বাইড, পেট্রম্যাক্স নিয়ে বেশ তো ছিলাম আমরা। কোনো দুঃখ, কোনো

রকম অভাব তো আমাদের ছিল না। কোথাকার গ্যাস বাতি জ্বালাতে গিয়ে এতবড় অঘটন ঘটে গেল।

মুখ নীচু করে অপরাধীর মতন বসে থাকলাম আমরা। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেললাম।

শেষে বিজন বলল, "হ্যাঁ রে, একবার মামাকে দেখতে যাওয়া যাবে না?"

অন্তু বলল, "যাবে। কথাবার্তা বলা যাবে না। মামা আমায় ইশারা করে তোদের নিয়ে যেতে বলেছে। চল। কাল সকালের দিকেই মামা কলকাতা চলে যাবে।"

আমরা তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম।

অন্তুদের বাড়ি এসে চোরের মতন পা টিপে টিপে মামার ঘরে গেলাম। জ্যাঠাইমা, লিলিদি, ডলি কেউ আমাদের দেখে ফেলুক আমরা একেবারেই চাইছিলাম না।

একেবারে পাশের ঘরে বিছানায় মামা শুয়ে ছিলেন। ঘরে ছোট একটা বাতি জ্বলছিল। আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশী। মামা টান হয়ে শুয়ে। পায়ের ওপর কম্বল চাপানো, কোমর পর্যন্ত। উঁচু বালিশে মাথা। মাথার দিকে একটা সাদা তোয়ালে পাট করে ব্রহ্মতালুর ওপর ঢাকা। চোখ বুঁজে মামা শুয়েছিলেন। ঘরের জানলা বন্ধ। কর্পূর পোড়ার গন্ধ বাতাসে।

আমরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে থাকলাম। কোনো কথা নয়, শব্দ নয়। একদৃষ্টে মামাকে দেখছিলাম। কি রকম যেন দেখাচ্ছিল মামাকে। অত বড় অসুখ হলে হয়ত এই রকমই দেখায়।

অনেকক্ষণ পরে মামা চোখের পাতা খুললেন। আমাদের যেন দেখতেই পেলেন না। আবার চোখ বুঁজলেন। খানিক পরে তাকালেন, আমাদের মুখ দেখলেন। চিনতে পারছেন কিনা বোঝা গেল না।

শেষে চিনতে পারলেন। ঠোঁটে মুখে পাতলা একটু হাসি এল। দুঃখের হাসি। তাকিয়ে থাকতে থাকতে ইশারায় যেন অন্তুকে কি বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

প্রথমটায় না হলেও অন্তু ইশারা বুঝতে পারল। ঘর থেকে চলে গেল।

মামা আস্তে আস্তে হাত নেড়ে যেন আমাদের সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন। আমরা বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে উঠছিলাম।

অন্তু আবার ঘরে এল। হাতে কাগজ-পেনসিল। মামাকে দিল।

মামা উঠতে পারলেন না। সোজা হয়ে শুয়ে বুকের তলায় কাগজ রেখে আন্দাজে কি যেন লিখলেন বড় বড় করে, লিখে কাগজটা অন্তুর হাতে দিলেন।

অন্তু পড়ল। তারপর আমাদের হাতে দিল।

মামা তো ঠিক মতন লিখতে পারেননি, কষ্ট হয়েছে, লেখা জড়িয়ে গেছে, তবু আমরা লেখাটা পড়তে পারলাম।

মামা লিখেছেনঃ ব্রজ কোথায়? তাকে খোঁজ। দুঃখ করিস না।

আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করে দাঁড়িয়ে থাকলাম। মামা আবার চোখ বুঁজলেন।

বাইরে এসে অন্তু বলল, "ব্রজ কোথায়?"

সেই সকালে যখন অত কাণ্ড ঘটছে তখন থেকেই ব্রজ বেপাত্তা। প্রথমে নজর পড়েনি; পরে পড়েছিল। আমরা ভেবেছিলাম— ব্রজ আগুন নেবাবার জন্যে লোক ডাকতে ছুটেছে। তারপরও ব্রজ এল না। বিপদের সময় ছাই কি সব জিনিস মনে থাকে! আমাদেরও যা হাল হয়েছিল তাতে যে যার বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। ব্রজকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামাইনি।

কানুদের বাড়িতে বিকেলে আমরা সকলেই এলাম, ব্রজ এল না। তখন ব্রজর কথা উঠেছিল। কে যেন বলল, ব্রজ সারা রাত ঠায় বসেছিল বলে শরীর খারাপ হয়েছে বোধ হয়, বাড়িতে ঘুমোচ্ছে। হতে পারে। আমরা আর ও নিয়ে ভাবিনি।

মামার চিরকুট দেখে এবার সকলেই বেশ অবাক হয়ে গেলাম। সত্যি, ব্রজ কোথায়? সকাল থেকে সে বেপাত্তা কেন? ব্যাপারটা কি? একবারও সে এল না কেন?

বিজন বলল, "রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে।"

ঠাট্টা করে কানু বলল, "তোর স্মিথ তো!"

অন্তু বলল, "ব্রজর বাড়ি চল।"

ব্রজর বাড়ির দিকে আমরা পা চালালাম।

ব্রজর বাড়ি গিয়ে দেখি, সে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। তার চোখমুখ একেবারে কালির মতন কালো। গালে দাগ, কালশিরে পড়েছে।

আমাদের দেখে ব্রজ হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

সেই কান্না আর থামে না। শেষে ব্রজ খাটিয়ার ওপর উঠে বসল। তার হাত, পিঠ, বুক এমন কি গলাতেও দাগ। ফুলে গেছে অনেক জায়গা। ছেঁকাও খেয়েছে। একটা মলম লাগানো রয়েছে পোড়া জায়গায়। বিজন বলল, "হয়েছেটা কি তা তো বলবি?"

ব্রজ যা বলল আমরা তা স্বপ্নেও ভাবিনি। ব্রজ বলল, শেষ রাতে সে একবার একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙতেই তার মনে হল, কাজটা ঠিক হচ্ছে না। সবাই ঘুমিয়ে আছে, এসময় খারাপ কিছু হয়ে যেতে পারে। সে জেগে থাকার জন্যে চা তৈরী করবে ভেবে স্টোভ নিয়ে যন্ত্রঘরে ঢুকেছিল। শেষ রাতের শীত, একেবারে বরফের মতন ঠাণ্ডা সব। ভুট কম্বলে আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে, হনুমান টুপি চাপিয়ে ব্রজ যন্ত্রঘরে ঢুকে স্টোভ জ্বালাচ্ছিল।

বাইরে বাতাসে স্টোভ ধরানোও যেত না। ভেবেছিল, চা করে সবাইকে ডাকবে। ব্রজ যখন কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে স্টোভ জ্বালাচ্ছে, স্পিরিটের শিশিটা খোলাই ছিল, সবে দেশলাই জ্বালিয়েছে —এমন সময় কে যেন বাইরে থেকে তার ওপর লাফিয়ে পড়ল। ব্রজকে চেপে ধরল। ব্রজ ভেবেছিল গণেশজী। পালাবার চেষ্টা করতেই কম্বল খুলে গেল, স্পিরিটের শিশি উলটে গেল, আর আগুন জ্বলে গেল। জ্বলন্ত কম্বলটা পায়ে করে ব্রজ দূরে ছুঁড়ে দিতে পেরেছিল এইমাত্র। তারপর সেই ঘরের মধ্যে দক্ষযজ্ঞ। ব্রজ পালাবার চেষ্টা করছে, আর গণেশজী তাকে দম বন্ধ করে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে। শেষে ব্রজ বুঝতে পারল গণেশজী নয়, মামা। কিন্তু মামাও ব্রজকে ছাড়বে না, ব্রজও পালাবে। ধস্তাধস্তির মধ্যে ব্রজ কোনো রকমে মামার হাত ছাড়িয়ে পালিয়েছে। আর ওমুখো হয়নি।

আগুন লাগার ব্যাপারটা এতক্ষণে বোঝা গেল।

কানু কপাল চাপড়ে বলল, "তোর জন্যেই মামার ব্রেনে ধোঁয়া ঢুকে গেছে জানিস? মামার খুবই অসুখ, জাপানে চলে যাচ্ছেন তিনি।"

"কিতনা ধোঁয়া?" ব্রজ জিজ্ঞেস করল।

"এক শিশি", অন্তু বেশ রাগের সঙ্গে বলল, "জবাকুসুমের শিশির এক শিশি তো হবেই।"

ব্রজ হাত জোড় করে বলল, "আমার ঘিলুতে কার্বাইড্ আর গোবর ঢুকে গেছে ভাই। মাথায় চরকি মারছে। সারা শরীরে দরদ। জ্বালা করছে।"

অন্তু ধমক দিয়ে বলল, "চুপ কর। তোর মাথায় গোবর ছাড়া আর ছিল কি! এভরিথিং নষ্ট করে দিলি।"

ব্রজ অনুতাপের গলায় বলল, "আমার আফসোস হচ্ছে ভাই। মামার কাছে মাফ চাইব।"

ব্রজর মাপ চাওয়ার জন্যে মামা কি বসে থাকবেন! পরের

দিন তাঁর কলকাতা হয়ে জাপান যাবার কথা। আমরা মামার আরোগ্য কামনা করে যে যার বাড়ি ফিরে গেলাম।

পরের দিন মামা চলে গেলেন। আর আমাদের শহরে এলেন না কোনোদিন।